আলোচনা

(সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।)

সপ্তম ভাগ—সপ্তম বর্ষ।

(১৩১০ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ১২শ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ভক্তিরত্ন)

ও

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল (ভক্তিবিনোদ)

Published by the Proprietors

D. D. SURMA & SONS.

From the Alochona Samity, Howrah.

কলিকাতা ;

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, "বাণীপ্রেসে"

শ্রীনীলমণি ধর কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১১ সাল।

বার্ষিক মূল্য ১৷৽ দেড় টাকা।

[ডাকমাশুল [illegible] আনা

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।



আলোচনা সম্পাদক

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ভক্তিরত্ন)

আলোচনা।

সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

সপ্তম বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩১০ সাল। } প্রথম সংখ্যা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নববর্ষ—প্রথা আছে, নূতন বৎসরে একটা কিছু লিখিতে হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র কলেবরা আলোচনায় সে মুখবন্ধ, ভূমিকা বা ঐরূপ ধরণের একটা কিছু লিখিয়া স্থান পূর্ণ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। তবে যে বিঘ্নবিনাশন,—সর্ব্বকার্য্যের নিয়ন্তাপাতা জগদ্ব্যাপ্ত জগদীশ্বরের কৃপাবলে আলোচনা আজি সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল, তাঁহার নাম স্মরণ পূর্ব্বক, আর যে গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক সুহৃদ্‌বর্গের অনুগ্রহদৃষ্টিতে আলোচনাকে লইয়া এই নববর্ষে উপস্থিত হইতে পারিলাম, তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব নমস্কার, সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। ভরসা আছে, আমরা আমাদের কর্ত্তব্যপন্থা অনুসরণে কৃতকার্য্য হইতে পারিব,—তবে সংকল্প মানবের, সাধনসিদ্ধি ক্ষমতা ভগবানের।

মূল্য হ্রাস—উপহারের জন্য যে অতিরিক্ত আট আনা লওয়া হইতেছিল, তাহা আর লওয়া হইবেক না। মোট ১৷৷০ দেড় টাকাতেই উপহারের উৎকৃষ্ট পুস্তক, চারিখানি গ্রাহকগণকে প্রদান করিব। আর মাসে মাসে আলোচনা ত আছেই। এবারে কি লেখায়, কি ছাপা কাগজে আলোচনার সমধিক উন্নতি করিতে আমরা সচেষ্ট থাকিব।

ফুরাইয়া গিয়াছে—দ্বাদশ সংখ্যা আলোচনার বিজ্ঞাপিত উপহারের ছয়খানি পুস্তকের মধ্যে "খোকাবাবু প্রসঙ্গে" এবং "রায় সাহেব" পুস্তক দুইখানি ফুরাইয়া গিয়াছে। সুতরাং আর দিতে পারিব না।

বিশ্ববিমোহন উপহার—চারিখানি অপূর্ব্ব উপাদেয় পুস্তক। আমরা লাভের দিকে দৃষ্টি রাখি না, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতিই আমাদের লাভ। তাই এত অল্প মূল্যের কাগজের সহিত এরূপ উপহার দিতেছি। উপহারের পুস্তক চতুষ্টয় যথা—"অদ্ভুত ডাকাত", "লীলা", "সন্ন্যাসী জীবন" এবং "আজগুবি গল্প"। পুস্তক কয়খানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার প্রণীত, প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ। যিনি যে ভাবে মজেন, যে রসে আনন্দিত হয়েন, যেরূপ ঘটনাবৈচিত্রে মুগ্ধ হয়েন, পুস্তক চারিখানিতে তাহাই পাইবেন। আর কোন খরচা নাই—উপহার সমেত এক বৎসর কাগজ পাইবেন,—মাত্র দেড় টাকাই গ্রাহকের লাগিবে।

পুরাতন গ্রাহকগণের মধ্যে এখনও যাঁহারা উপহার পুস্তক পত্র লিখিয়া গ্রহণ করেন নাই,—তাঁহাদের নিকট আমরা উপহারের ঐ পুস্তক চারিখানি ভিঃ পিতে পাঠাইয়া সর্ব্বসমেত ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র গ্রহণ করিতেছি। সর্ব্বত্রই পাঠান হইতেছে। যাঁহাদের নিকটে এখনও পুস্তক পঁহুছায় নাই, দুই চারি দিন মধ্যেই তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন।

কমিশনার নির্ব্বাচন—বিগত ২৪ ও ২৫শে এপ্রেল হাওড়া মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ হইয়াছে। নির্ব্বাচন ব্যাপারে ঐ দুই দিন হাওড়া টাউনহল লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। সকল ওয়ার্ডের সম্যক বিবরণ প্রকাশ করিবার স্থান আলোচনায় নাই। অদ্য আমরা পাঁচ, ছয়, সাত নম্বর ওয়ার্ডের কথাই বলিব। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী ছিলেন তিনজন—বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শিবচন্দ্র বসু ও ডাক্তার শরৎচন্দ্র দত্ত। তাহার মধ্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—উমেশ বাবু ও শরৎ বাবু। উমেশ বাবুর এ কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি আছে। অধিবাসীগণের বিপদাপদে তিনি প্রাণপণে উপকার করিয়া থাকেন। তিনি ঐ পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন দেখিয়া, আমরা সুখী হইয়াছি, শরৎবাবু এ পদে

এই নূতন অধিষ্ঠিত, কার্য্য কলাপ না দেখিয়া কোন কথা বলা যায় না, তবে তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত যুবকের দ্বারা আমরা সুফলের আশা করিতে পারি। ছয়ের নম্বর ওয়ার্ডে পাঁচ জনের মধ্যে রায় নরসিংহ চন্দ্র দত্ত বাহাদুর ও বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহারা চিরকালই এই পদে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন, নূতন পরিচয় আর কি দিব। সাতের নম্বর ওয়ার্ডে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—বাবু আশুতোষ বসু ও বাবু নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহারা দুই জনেই এই পদে অধিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি। এক্ষণে কমিশনারগণ প্রজাবর্গের হিত-সাধনে যত্নবান হইলে আমরা সুখী হইব।

ভক্তের ভগবদ্ভক্তি।

প্রথম স্তবক।

"ভেবে ভেবে যে দেহটা মাটী ক'রে ফেল্লে দেখছি? কেন ভাব্‌ছ, কিসেই বা এত ভাবনা হ'ল, জিজ্ঞাসা কর্‌লেও কোন কথার উত্তর দাও না, রাত নাই, দিন নাই, কেবলই ভাব্‌না। একবার শরীরটার পানে চেয়ে দেখ দেখি, কি ছিলে—কি হ'য়েছ? অমন কাঞ্চন-বর্ণ নধর শরীরটা শুকিয়ে, যেন পোড়া কাঠখানা হ'য়ে গেছে, মাথা খাও ভাই, তোমাব ভাব্‌নার কারণটা একবার প্রকাশ করে বল? তোমার এ অবস্থা দেখে, আমার অত্যন্ত মনোকষ্ট হচ্ছে।"

"তোমাকে বল্লে এ ভাব্‌না দূর হবে না।"

"তোমার ভাই কেবল ঐ এক কথা, সদাই বল,—'তোমাকে বল্লে এ ভাব্‌না দূর হবে না'—বলি, ভাব্‌না দূর হবেই বা না কেন? আর, ভাব্‌নাই বা কি এমন গুরুতর; একবার শোনালে কি কিছু দোষ আছে?"

"দোষ আর এমন কি! তবে কথাটা হচ্ছে, তোমরা স্ত্রীলোক, তোমাদের কাছে এ কথা বলা না বলা তুল্য, আমার ভাবনা দূর কর্‌তে পার, তোমার এমন ক্ষমতা কিছুই নাই।"

"স্বীকার করি, আমাদের কিছুই ক্ষমতা নাই,—আর, এজন্য তুমি আমাদের যথেষ্ট হেয়জ্ঞানও কর্‌তে পার, এ কথাও সত্য; কিন্তু তাই

ব'লে যে আমরা নিতান্তই অসার পদার্থ, এরূপ ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখা কর্ত্তব্য নয়। এ সংসারে কাহাকেও হেয়জ্ঞান কর্‌তে নাই। আমরা এমন প্রায়ই দেখ্‌তে পাই, এক একটা তুচ্ছ বস্তু হ'তেও, সময়ে সময়ে অনেক মহৎকার্য্য সম্পন্ন হয়। তুমি আমাকে বোধ-বুদ্ধিহীনা সামান্য স্ত্রীলোক ব'লে অবজ্ঞা ক'র্‌ছ, কর—তা'তে দুঃখ নাই, কিন্তু তোমার জানা উচিত যে, আমাদেরই ন্যায় এক একটা অকিঞ্চিৎকর প্রাণী, জগতে অনেক অক্ষয়কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন। সেই সকল যশস্বিনীদিগের নামোল্লেখ ক'রে, কোনরূপ গর্ব্ব প্রকাশ কর্‌বার ইচ্ছা আমার নাই। তবে, একটা বিষয়ে, তোমাকে জোর ক'রে ব'লবার, আমার কিছু অধিকার আছে। দেখ ভাই, আমি ত তোমার ধর্ম্মপত্নী সত্য; যদি আমাতে সতীত্ব থাকে, যদি একদিনের জন্যও আমি অকপটচিত্তে তোমার পদসেবা করে থাকি, তবে নিশ্চয়ই বল্‌ছি, যেমন করে পারি, তোমার ভাবনার প্রতিকার কর্‌বো; যদি এর জন্য জীবন দিতে হয়, তাতেও প্রস্তুত আছি। পতির দুঃখ সতীর পক্ষে শেলস্বরূপ; তোমাকে সতত চিন্তাকুল ও বিষণ্ণ দেখে, আমার প্রাণধারণে কিছুমাত্র সুখবোধ হচ্ছে না। তাই আবার বল্‌ছি, শীঘ্র তোমার ভাব্‌নার কারণ ব্যক্ত কর, আমি প্রাণ দিয়াও তাহার প্রতিবিধান কর্‌বো। আমার জীবন-বিনিময়ে, যদি তোমার দুঃখের শান্তি না হয়, তবে সে জীবন রাখায় ফল কি?"

"পার্‌বে?"

"পার্‌বো।"

"পার্‌বে?"

"পার্‌বো।"

"পার্‌বে?"

"কেন নাথ! এত ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ? সতী, পতির সহিত, কবে প্রতারণা ক'রেছে? পূর্ব্বেও ব'লেছি, এখনও বল্‌ছি,—যেমন ক'রে পারি, তোমার ভাবনার প্রতীকার কর্‌বো।"

"তবে শোন আমার ভাবনার কারণ। সেদিন রাজবাড়ীর পূজা শেষ ক'রে, পূজার দালানের বাহিরে এসে, কুক্ষণে রাজ-অন্তঃপুরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেছিলেম। অন্তঃপুরের একটা অট্টালিকার ছাদে যে দৃশ্য দেখেছি, হায়! তা' কেমন ক'রে ভুল্‌বো! তেমন মনোহর দৃশ্য, ইহ-

জীবনে ভুলবার নয়। আহা! কি অদ্ভুত রূপই দেখ্‌লেম, শারদাকাশে এককালে কোটী পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হ'লেও বুঝি, সে রূপজ্যোতির সাদৃশ্য লাভ কর্‌তে পারে না। আমি, কিয়ৎক্ষণের জন্য আত্মহারা হ'য়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে, সেই রূপরাশির দিকে চেয়ে থাক্‌লেম; দেখলেম, সেই অপরূপ রূপবিভা এক অলোকসামান্যা রমণীমূর্ত্তি হ'তে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, ভাব্‌লেম, এ নিশ্চয়ই কোন দেবকন্যা, ধরাতলে অবতীর্ণা হ'য়েছেন; অথবা রাজভাণ্ডারের অতুলনীয় ধনৈশ্বর্য্যের কথা ব্যক্ত কর্‌বার জন্য, বুঝি রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হ'য়ে শোভা পাচ্ছেন। একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে দেখ্‌লেম, তা নয়,—ইহা কোন দেবীমূর্ত্তি নয়—এক ভুবনমোহিনী অনন্ত সৌন্দর্য্যাধার মানবীমূর্ত্তি! প্রিয়ে! কামিনী-কলেবরে এত রূপ থাকে, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। হায়! সেই বিদ্যুদ্বরণাবয়বর্ণিনী, ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়ে অমনি অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আর একবার সেই মূর্ত্তিখানি দেখবার জন্য, কত চেষ্টা করলেম, কতক্ষণ সেইখানে স্থির হ'য়ে দাঁড়ায়ে থাক্‌লেম, কিন্তু হায়! অভাগার ভাগ্যে সে রূপদর্শন আর ঘটলো না; জানি না, আমার মনপ্রাণ চুরি করে সে কোথায় লুকা'ল!—এই আমার ভাবনার কারণ, এর জন্যই আমার প্রাণে এত ব্যাকুলতা। বল, এখন কেমন ক'রে আর একবার সেই রূপখানি দেখ্‌তে পাই? দুইবার নয়, দশবার নয়, কেবল একবার—কেবল একবার মাত্র দেখ্‌লেই, আমার সকল যাতনা, সকল দুঃখ দূর হ'বে।"

"কি ভীষণ কথা! এ যে তোমার বিষম দুরাকাঙ্ক্ষা দেখ্‌ছি; নিশ্চয়ই তুমি, রাজকন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখেছ, নচেৎ এমন রূপ কাহাতে সম্ভবে? সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ তুমি,—হায়। তোমার এমন দুর্ম্মতি কেন হ'ল? দুর্লভ রাজকন্যায় তোমার এ অসম্ভব লালসা কেন হ'ল? তুমি বামন হয়ে শশধর-ধারণে করোত্তলন করেছ, ক্ষুদ্র ভেলকসাহায্যে অনন্ত অকূল জলধি অতিক্রমে প্রয়াসী হ'য়েছ! ভুজঙ্গ-বিবরে হস্তক্ষেপণ, কেশরীক্রোড়স্থ শাবক অপহরণ, পঙ্গুর পর্ব্বত চূড়ায় আরোহণ একদিন বরং সম্ভবে, কিন্তু তোমার এই দুষ্প্রবৃত্তির পরিপূরণ, নিতান্তই অসম্ভব। তাই বলি, এই কু-আশার বিসর্জ্জন দাও, দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের দুরাশা পরিত্যাগ কর, সাধ করে শরীরপাত ক'র না।"

"আমি ত পূর্ব্বেই ব'লেছি—'তোমাকে বল্লে এ ভাবনা দূর হবে না,—

আমার আশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখেই ত আমি এত ভাবনাগ্রস্ত। তুমি না বল্লে,—'আমি, নিশ্চয়ই তোমার ভাবনার প্রতিকার করবো,—খুব প্রতিকার করলে—খুব পতিভক্তি দেখালে, সতী নারী এম্‌নি করেই পতিকে প্রতারিত করে বটে!"

"কেন, আমি কিসে তোমার সঙ্গে প্রতারণা করলেম? অভক্তিই বা আমার কিসে দেখ্‌তে পেলে? আমি যখন প্রতিজ্ঞা ক'রেছি—জীবন পর্য্যন্ত পণ ক'রেছি, তখন যেমন ক'রে পারি, তোমার দুঃখের—তোমার দুর্ভাবনার প্রতিকার ক'রবো, কিন্তু ব্যাপারটা বড়ই গুরুতর—বড়ই দুরাশা-মূলক; সেই জন্যই তোমাকে কয়েকটি কথা বল্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলেম, কথা কয়টি বোধ হয়, তোমার পক্ষে কর্কশজনক বোধ হ'য়েছে; যাহা হউক, এজন্য যদি আমার কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে, দয়া করে মার্জ্জনা কর।"

"আঃ। সে জন্য তোমাকে দুঃখিত হ'তে হবে না, এতে তোমার কিছু অপরাধ হয়নি; এখন, আমার দুঃখটা যাতে দূর হয়, তার উপায় দেখ।"

"পূর্ব্বেই ত ব'লেছি, ব্যাপারটা ভারী গুরুতর, অনেকটা ভেবে চিন্তে উপায় স্থির করতে হবে,—একটু সময়ের দরকার; কা'ল ইহার সদুপায় স্থির করবো।"

পাঠক মহাশয় আসুন, এই অবকাশে আমরা, একবার দম্পতিযুগলের কিঞ্চিৎ পরিচয় জানিয়া লই। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রামনগর একখানি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। গ্রামখানিতে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস। রাজা প্রতাপ রায় বাহাদুর, ঐ গ্রামের একজন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার। রাজা বাহাদুরের অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপ্রমেয় ধনরত্নের কথা দেশদেশান্তরে বিখ্যাত। কিন্তু, তিনি এত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও, পুত্রধনে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী নাম্নী একমাত্র অতুলনীয়া রূপশালিনী দুহিতাই ঐ বিপুল বৈভবের ভাবী উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। রাজবাটীতে নিত্য দেবসেবা ছিল। ঐ গ্রামের উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ, উক্ত দেবসেবার কার্য্য সম্পন্ন করিত। পাঠক মহাশয়, ইতিপূর্ব্বে যে দম্পতি-যুগলের কথোপকথন শুনিয়াছেন, এই উমেশচন্দ্রই, তাঁহাদের মধ্যে একজন। উমেশের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে, পাঁচ ছয় কাঠা আন্দাজ বাস্ত জমি এবং একখান খড়োঘর মাত্র পুঁজি ছিল, রাজবাটীর দেবসেবা চালাইয়া, কোনরূপে

দিন গুজরান্ করিত। উমেশের বয়ঃক্রম এক্ষণে ২৩।২৪ বৎসর। ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর, তিন চারি বৎসরের মধ্যে উঁহার পিতা মাতা, পরলোকগমন করেন। পরিবারের মধ্যে এক্ষণে ইনি এবং ইহাঁর একমাত্র পত্নী লক্ষ্মীমণি বিদ্যমান্। পত্নী লক্ষ্মীমণির রূপগুণ দুই-ই ছিল। পতি নিতান্ত দরিদ্র হইলেও, এবং সর্ব্বদা নানারূপ অভাবের মধ্যে বাস করিলেও, তিনি কখনও স্বামীকে কোন বিষয়ের জন্য বিরক্ত করিতেন না। পতির প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, পাঠক মহাশয়, ইতিপূর্ব্বে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয়ও প্রাপ্ত হইয়াছেন।

একদিন গত হইয়া গিয়াছে। অদ্য লক্ষ্মীমণির পতির দুর্ভাবনা দূরীকরণের উপায় স্থির করিবেন। আসুন পাঠক মহাশয়! আমরা একবার উমেশের গৃহে গমন করি, পতিপরায়ণা লক্ষ্মীমণি কি উপায় স্থির করিয়াছেন, শ্রবণ করা যা'ক।

ঐ দেখুন, একখানি তৃণাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র মৃন্ময়গৃহের অভ্যন্তরে, চিন্তাকুল উমেশচন্দ্র, গণ্ডদেশে করতল বিন্যস্ত করিয়া, উপবেশন করিয়া আছেন, পুরোভাগে পত্নী লক্ষ্মীমণি ম্লানমুখে উপবিষ্টা। চিন্তার প্রগাঢ় কালিমায় লক্ষ্মীমণির বদনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন; কি করিবেন, কি উপায়ে পতির দুশ্চিন্তার অপনোদন হইবে, ইহাই তাঁহার একমাত্র ভাবনার বিষয়ীভূত। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত কাহারও স্নানাহার হয় নাই। লক্ষ্মী যথাসময়ে পাকশাক সম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পতি,—"এখনও ক্ষুধা হয় নাই, আর একটু পরে আহার করিব," ইত্যাদি প্রকারে বারংবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আহার গ্রহণের জন্য তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিতে ক্রটী করেন নাই,—কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে না পারায়, অগত্যা চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে, পাছে স্বামী বিরক্ত হন, এজন্য আর কোন কথার উত্থাপন করিতে সাহসী হ'য়েন নাই। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় ক্ষেপন করিয়া, উমেশচন্দ্র বলিলেন, "কতদূর?—দিনমান ত প্রায় শেষ হ'তে চল্লো, এখনও উপায়টা ঠিক কর্‌তে পার্‌লে না?"

লক্ষ্মী। ঠিক এক প্রকার হয়েছে, খাওয়া দাওয়া কর, তারপর বল্‌ছি।

উমেশ। না না লক্ষ্মী! তুমি আগে বল, তোমার বলা শেষ হ'লেই,

আহার করবো। প্রাণ বড়ই উচাটন হ'য়েছে, যাতনার অনল দিন দিন দ্বিগুণতর হ'য়ে, দেহ মন দগ্ধ ক'রে ফেল্‌ছে। স্বামীর জীবনরক্ষা করা যদি সতীর কর্ত্তব্য হয়, তবে কি উপায় করেছ, অবিলম্বে ব্যক্ত কর। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার শরীরের অবস্থা ক্রমশ যেরূপ হ'চ্ছে, যদি আর দুই একদিন ইতস্ততঃ ক'রে কাটাও, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে আমার প্রাণের আশায় বিসর্জ্জন দিতে হবে।

লক্ষ্মী। ইতস্ততঃ কর্‌বো কেন? সত্যই উপায় স্থির হ'য়েছে। দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর, আহার না করে যদি এখনই শুন্‌বার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, ব'লছি।—তোমার ভাবনাটা যেমন কঠোর, আমার উপায়টা, বোধ হয় তদপেক্ষা সহজ হবে না। এখন আমি যা' বলি, স্থির হ'য়ে শোন,—কারণ আমি, যে কথাগুলি বল্‌বো, তোমাকে ঠিক সেইমত চল্‌তে হবে—একটু এদিক ওদিক হ'লেই সব পণ্ড—সব বিফল। যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তোমাকে কিছুদিন ধরে অনেকটা ক্লেশভোগ কর্‌তে হবে, কাজটা বড় সোজা নয়।

উমেশ। আর ভাই, তোমার এত গৌরচন্দ্রিকায় কাজ নাই, এখন আসল কথাটা ফস্‌ ক'রে ব'লে ফেলো।

লক্ষ্মী। ভাই, সকল বিষয়েই একটু ধৈর্য্য অবলম্বন আবশ্যক, উতলা হ'লে, কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না; ভাবীসুখপ্রদ কর্ম্মমাত্রেরই মূলে দুঃখ। প্রথমতঃ,—

লক্ষ্মীর কথায় বাধা দিয়া, উমেশ বলিলেন, "আবার, মহাভারত আওড়া'তে লাগ্‌লে? লক্ষ্মী, আমি ত দুঃখের সাগরেই ডুবে আছি, তোমার বর্ণিত দুঃখজনক কার্য্য, বোধ করি আমার উপস্থিত দুঃখের তুলনায় অনেক লঘু হবে।—সমুদ্র যার শয্যা, শিশির-সম্পাতে তা'র ভয় কি? বল লক্ষ্মী—শীঘ্র বল, জ্যোতির্ম্ময়ীর দর্শনলাভের আশা থাক্‌লে, আমার কোন কার্য্যই অসাধ্য হবে না। দুঃখভোগ ত তুচ্ছ, যদি সেই রূপমাধুরী একবার দৃষ্টি ক'রে, আমাকে প্রাণত্যাগ করতে হয়, তা'তেও প্রস্তুত আছি।"

স্বামীর মানসিক অবস্থা দেখিয়া, লক্ষ্মীমণি বিস্মিত, ভীত, ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন,—কিন্তু বাহ্যাবয়বে বা বাক্য দ্বারা তদবস্থা বিন্দুমাত্রও পরিব্যক্ত না করিয়া বলিলেন,—"এইবার তোমাকে উপায়টি ব'লে দিচ্ছি।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর, এই উপায়টি অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ ক'রেছি।—তোমাকে ভাই, কিছুদিনের জন্য জন্মভূমির মায়া ত্যাগ কর্‌তে হবে, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতায় বিসর্জ্জন দিতে হবে, যেখানে গেলে কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই, এরূপ কোন স্থানে অন্যূন তিন বৎসর কাল অতিবাহিত কর্‌তে হবে। তোমার এই সময়ের বেশটি সন্ন্যাসীদের মত হওয়া আবশ্যক। নখ, দাড়ি, চুল সমস্তই অকর্ত্তিতাবস্থায় রাখ্‌তে হবে।"

উমেশ। তার পর?

লক্ষ্মী। তার পর, যেই তিন বছর পূর্ণ হয়ে যাবে, অমনি বাড়ী চলে আস্‌বে। ঐ সন্ন্যাসীর বেশেই আস্‌তে হ'বে।—কোথায় থাক্‌বে, কি কি করতে হবে, পরে বল্‌ছি।

উমেশ। বল লক্ষ্মী, তোমার অদ্ভুত বুদ্ধিচাতুর্য্য দর্শনে আমি যারপর-নাই বিমুগ্ধ হ'য়েছি।

লক্ষ্মী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমাদের গ্রামের পশ্চিম-দিগ্বর্ত্তিনী ভাগীরথীতীরে, যে শ্মশানভূমি আছে, নির্দ্ধারিত সময় গত হ'লে তুমি, ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হ'বে, আবশ্যক কাল পর্য্যন্ত ঐ স্থানেই অবস্থিতি কর্‌তে হবে। তোমার সন্ন্যাসীর বেশটা, যেন বেশ জমকাল রকমের হয়,—বাহ্যদৃশ্যে কেউ যেন তোমাকে ভণ্ড সন্ন্যাসী বলে চিন্‌তে না পারে। শ্মশানে এসে, ভগবদ্‌সমাহিতচিত্ত যোগী পুরুষের ন্যায় ধ্যানস্তিমিত নয়নে নিয়ত কালযাপন কর্‌তে থাক্‌বে। আহারীয় দ্রব্যের জন্য তোমাকে কিছুমাত্র ভাব্‌তে হবে না,—পথে, ঘাটে, লোক-চলাচল বন্ধ হ'লে, রাত্রিযোগে এক সময় আমি সে সব দিয়ে আস্‌বো; লোকে ভাব্‌বে, সন্ন্যাসী আহার করেন না, সুতরাং ইহাতে তোমার শীঘ্রই সুনাম রাষ্ট্র হ'বে সন্দেহ নাই। তোমাকে অধিক দিন এরূপভাবে শ্মশানে থাক্‌তে হবে না, পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই পূর্ণমনোরথ হবে, এরূপ আশা করি।

উমেশ। লক্ষ্মী, তোমার কথাগুলি আমার মনে লেগেছে। তোমার যুক্তি অনুসারে কাজ কর্‌লে, আমার আশা পূর্ণ হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ব'লে বোধ হচ্ছে। যা'হ'ক, অদ্যই তুমি, আমার পরিধেয় বস্ত্রগুলি গৈরিক-রঙ্গে রঞ্জিত ক'রে রাখ্‌বে, কাল প্রত্যুষেই আমি বাটী হ'তে বাহির হ'ব।

"কাল প্রত্যুষেই বাটী হ'তে বাহির হব"— এই কথা শুনিয়া সতী লক্ষ্মী লক্ষ্মীমণির হৃদয়খানি অকস্মাৎ বাতবিক্ষুব্ধ বারিনিধির ন্যায় বিধুনিত, উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। প্রাণের দেবতা, হৃদয়াকাশের সমুজ্জ্বল শারদশশধর, সতীর সার সর্ব্বস্ব, লক্ষ্মীর ইহ-পরকালের অভীষ্ট ফলদাতা, অনন্ত সুখনিধান প্রাণের প্রাণ পতিদেবতা হারা হইয়া, তিন বৎসর কাল,—সেই কালসম বিশাল বিরাট তিন বৎসর কাল, কিরূপে অতিবাহিত হইবে, এই অসহনীয় দুশ্চিন্তার শত বৃশ্চিকদংশন যাতনায় তাঁহার সমস্ত কলেবর জর্জ্জরিত ও কালিমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে, পতির গন্তব্য পথের পরিপন্থী হইয়া, বাঞ্ছিত বিষয় হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবারও সাহসে কুলাইল না,— পাছে, পতির কোন অমঙ্গল সংঘটিত হয়—পাছে, রাজকন্যার দুশ্চিন্তারূপ বিকট রাক্ষসীর করাল গ্রাসে তাঁহার প্রাণপতি প্রাণ সমর্পণ করেন। লক্ষ্মী বহুকষ্টে মানসিক অবস্থা সংযত করিয়া বলিলেন, "বস্ত্রগুলি অদ্যই রঞ্জিত করে রাখ্‌বে।"

ধন্য সতি! ধন্য তোমাদের মহিমা। এই পাপ-প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে তোমরাই প্রকৃত পুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছ; এই কপটতা, স্বার্থপরতার লীলাভূমি ভব-রঙ্গালয়ে তোমরাই যথার্থ স্বর্গীয় অভিনয় সন্দর্শনে সমর্থ; তোমাদের নিঃস্বার্থ প্রেম, অকপট আত্মত্যাগ, অত্যদ্ভুত প্রণয়-প্রীতি, স্বার্থকাপট্য কণ্টকাকীর্ণ জগতীতলে ত্রিদিবদুর্লভ অপরূপ কুসুমাস্তরণ বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। স্বামীপদে অবিচলিত ভক্তি রাখিয়া, ভর্ত্তার মনস্তুষ্টি সাধনার্থ, তোমরা অসাধ্য সাধন করিতে পার, অঘটন সংঘটন করিতে পার। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই যুগ চতুষ্টয়ে জগতে কত পরিবর্ত্ত সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু তোমরা যে সকল অলৌকিক কীর্ত্তি সংরক্ষিত করিয়া গিয়াছ, সে সমুদয় অনুমাত্র বিলুপ্ত হয় নাই। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি সতী-শিরোমণিগণের সুমধুর নাম, অলৌকিক কীর্ত্তি-কলাপ স্মরণ করিলে, কাহার অন্তঃকরণ আনন্দরসে আপ্লুত না হয়? কাহার হৃদয়-নিহিত ভক্তিসিন্ধু অভিষ্যন্দায়মান না হইয়া উঠে? যতদিন জগত থাকিবে, যতদিন জগতে মানবের সত্বা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তোমাদের মহীয়সী কীর্ত্তিগাথা প্রত্যেক লোকের হৃদয়ে সুবর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে সন্দেহ নাই। [ক্রমশঃ]

শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপধ্যায়।

খুনের দায়।

(ডিটেক্‌টিভের গল্প)

"ভগবান মানুষের সুখ-স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত সকলি দিয়াছেন, কিন্তু উড়িবার জন্য পাখা দেন নাই কেন? দয়াময় যদি দয়া করিয়া মানুষকে পাখা দিতেন, তবে বুঝি কাহারও বিন্দুমাত্রও দুঃখ থাকিত না। মানুষের প্রাণের জ্বালা বুঝি তাহা হইলে নিবৃত্তি হইতে পারিত। তাহা হইলে এখন একবার ঐ নীল আকাশের কোলে উড়িয়া সুরবালার মুখখানি দেখিয়া আসিতাম। এতক্ষণ হয়ত সে, প্রাচীর-বেষ্টিত বাড়ীর মধ্যে রকের উপর বসিয়া, ঐ সুনীল আকাশের দিকে চাহিয়া আছে! হায় সুরবালা! আর তোমাকে বুঝি দেখিতে পাইলাম না। ইহজন্মে বুঝি আর তোমার সেই মধুর কথা শুনিতে পাইলাম না।"

যিনি এই কথা বলিয়া হতাশের দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে নিস্তব্ধ হইলেন, তিনি বয়সে নবীন,—জাতিতে কায়স্থ। তাহার নাম দ্বিজেন্দ্র।

শরতের সুনির্ম্মল আকাশের তলে, চূর্ণী নদী আপন মর্ম্মগাথা গাহিতে গাহিতে আপনি চলিয়াছে, বৈকালের বায়ু ধীরে বহিয়া, বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া, ফুলের পরিমল চুরি করিয়া, আপন মনে আপনি চলিয়া যাইতেছে; নদী-তীরস্থ অশ্বত্থবৃক্ষের চূড়ায় বসিয়া একটা পাখী "বউ কথা কও" বলিয়া চেঁচাইয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে, আর চূর্ণীর তীরে বসিয়া দ্বিজেন্দ্র একবার উড়িবার জন্য আকুল হইতেছে।

আসল কথা এই;—দ্বিজেন্দ্রনাথের যে গ্রামে বাস, সেই গ্রামে নীলমাধবেরও বাস। নীলমাধবের একটি কন্যা আছে, তাহারই নাম সুরবালা। দ্বিজেন্দ্র অনেকদিন হইতেই সুরবালার রূপরাশি, তাহার সেই সুন্দর সহাস মুখখানি, সেই ভ্রমরকৃষ্ণগঞ্জিত কুঞ্চিত চুলগুলি, সেই ডাগর ডাগর চক্ষু দুটি, প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, আর মনে ভাবিয়াছে, যদি সুরকে লইয়া সংসারতরঙ্গে ভাসিতে পারি, তবে বুঝি আমাদের সাধের তরণী বাণচাল হয় না। সুরকে বিবাহ করিতে পাইলে দ্বিজেন্দ্র বুঝি জগতের আর কিছুই চাহে না। গ্রামের মধ্যে সুরবালার চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে, অনেক পদ্মফুল সে গ্রামে ফুটিয়া আছে, তবু সেই একখানি ক্ষুদ্রমুখের উপর দ্বিজেন্দ্রের এ ঝোঁক কেন? কেন তাহাকে পাইতে দ্বিজেন্দ্রের এ

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা? জানি না,—বুঝি না,—বুঝাইব কি? মায়াবাদী ইহা মহামায়ার খেলা বলেন,—আমরা বলি, যাহার খেলাই হউক, মানবের এ খেলা কিন্তু অনিবার্য্য। সকল মানুষেরই এমনি এক একখানি মুখ আছে। যে মুখের কাছে সারা জগতের সারা মুখগুলি অতীব ম্লান।

দ্বিজেন্দ্রের এত আকুল বাসনা,—কিন্তু সুরবালার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল না। দ্বিজেন্দ্র বাপের বড় ছেলে—কুল করিতে হইবে। সুরবালা অকুলীন কন্যা, কাজেই অন্যান্য সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও কৌলিন্য পাষাণে বাঁধিয়া তাহার বাসনা পূর্ণ হইল না। স্রোতস্বিনীর জল যেমন উপলখণ্ডের উপর আছাড় খাইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, দ্বিজেন্দ্রের বাসনাও তেমনি কৌলিন্য-পাষাণে আছাড় খাইয়া অতি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। বাসনার আগুনে তাহাকে অত্যন্ত দগ্ধ করিল,—দ্বিজেন্দ্র সুরবালাকে না পাইয়া সংসারে বিন্দুমাত্রও সুখ পাইল না। এই ঘটনার তিন চারি মাস পরে, দ্বিজেন্দ্র নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল; অনেক অনুসন্ধানেও দ্বিজেন্দ্রের কোন খোঁজখবর মিলিল না। এদিকে দেখিতে দেখিতে দশ বৎসর কাটিয়া গেল।

মিঃ ডি, ঘোষ জেলার জজ। জজ সাহেবের দায়রা বসিয়াছে, খুনী মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহর,—কিন্তু সূর্য্যের প্রকাশ নাই, বর্ষাকাল। সকাল বেলা হইতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে অদূরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ নদীর চঞ্চল বক্ষে কাল মেঘের ছায়া পড়িয়াছে, ঝাউগাছে বাতাস লাগিয়া সন্ সন্ শব্দ হইতেছে, কাছারির চারিদিকে বিচার-প্রার্থিগণ ছাতা মাথায় দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াই-তেছে;—আজি তারা সমস্ত প্রাণটুকু ভরিয়া বিচারকের দয়া প্রার্থনা করিতেছে। এ জগতে তাহাদের আর কোন কাজ নাই, আর কোন বাসনা নাই, যেন তাহারা এই কাজেই কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি-য়াছে, ইহাতে জয়লাভ করিতে পারিলেই তাহাদের সর্ব্ব কর্ম্ম সমাধা হইল। ব্যবহারজীবিগণ আপন আপন মক্কেলের পক্ষ সমর্থনার্থ বক্তৃতা করিতেছেন, আইন ঘাঁটিতেছেন, রুমালে কপোলদেশ মুছিতেছেন।

এই সময় একটি দীনা বিশীর্ণা অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে আসামীর কাঠরায় লইয়া আসিল। স্ত্রীলোকটীর সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতেছে,—দৃষ্টি মৃত্তিকা-সংলগ্ন। চাপরাসী হলফ্ পড়াইলে, সরকারী উকীল বলিলেন,—

"মুখের কাপড় খুলিয়া, আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করি বল।"

অবগুণ্ঠন মোচনে রমণী ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু চাপরাসী খুলিয়া দিতে উদ্যত হইলে, সে স্বয়ংই খুলিয়া ফেলিল। মুখখানি বড় ম্লান, বড় বিশুষ্ক বিশীর্ণ।

জজ সাহেব সে মুখের দিকে চাহিলেন। একবার, দুইবার, তিনবার চাহিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বেকার আর একটী অশ্রু সজল প্রীতি-সুকোমল সলজ্জ শঙ্কিত মুখ মনে পড়িল। মনে পড়িল,—সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

উকীল জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার নাম কি?"

ভয়ে জড় সড় হইয়া কম্পিতকণ্ঠে রমণী বলিল, "আমার নাম সুরবালা।"

জজ সাহেবের শরীরের সমস্ত রক্তটা একবার বিদ্যুদ্বেগে শরীরের সমস্ত জায়গায় ছড়াইয়া পড়িল। তিনি কপোলে হস্তার্পণ করিয়া টেবিলের উপর কনুইয়ে ভর দিয়া নিম্নদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন।

উকীল বলিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়?"

রুদ্ধকণ্ঠে রমণী বলিল, "আমি সমস্ত কথা, দারোগা এবং তৎপরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বলিয়াছি, আমি আর বলিতে পারিতেছি না। দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতাও আমার আর নাই। সেই সকল কাগজ-পত্র দেখিয়া আমার উপর যে হুকুম হয়, তোমরা তাই দাও না গো! আমার আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না গো!"

ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে রমণী যাহা স্বীকার করিয়াছে এবং যে অপরাধে সে অপরাধিনী হইয়াছে, জজসাহেব সরকারী উকীলকে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে বলিলেন। উকীল মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—

"এই স্ত্রীলোকটী হত্যাপরাধে অভিযুক্তা হইয়াছে। বিগত মে মাসের ১৭ই তারিখে ইহার স্বামীর সহসা মৃত্যু হয়। আকস্মিক মৃত্যু বলিয়া গ্রামের পঞ্চায়েৎ থানায় রিপোর্ট করায়, ইন্‌স্পেক্টর তদন্ত করিতে গিয়া ঐ মৃতদেহ পরীক্ষান্তে জ্ঞাত হন, উহার আর্সেনিক খাইয়া মৃত্যু হইয়াছে, মৃতের উদরে মিষ্টান্নমিশ্রিত আর্সেনিক ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর বিশেষ দক্ষতার সহিত তদন্ত করিয়াও খুনের অন্য কারণ বা লোক পান নাই। শেষে মৃতের স্ত্রী—এই সুরবালার চরিত্রবিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। মৃতের একটি বন্ধুর নিকট হইতে অবগত হয়েন যে, তিনি

বলেন, আমরা কখন সুরবালাকে অন্য পুরুষ সংসর্গে দেখি নাই, তবে মধ্যে মধ্যে সুরবালার স্বামী—আমার বন্ধু বলিত, "অন্যাভিলাষিণী স্ত্রীর স্বামী হওয়া, আর নরকের কীট হওয়া সমান। ভাই! সংসারে সুখ পাইলাম না। ইহার বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইবার চেষ্টা কতদিন করিয়াছি, কিন্তু আর কিছুই বলিত না।" ইন্‌স্পেক্টর ইহাতে বিশেষ সন্দেহ করিয়া, সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি তোমার স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাস কি?" সুরবালা কথার উত্তর দেয় না। তখন তিনি উহার বাক্স, পেটরা বিশেষ অনুসন্ধান করেন,—তন্মধ্যে কতকগুলি গুপ্তপ্রেমের চিঠি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে স্বতঃই তাঁহার মনে ধারণা হইল—সুরবালা কর্ত্তৃকই এই হত্যাকার্য্য সমাধা হইয়াছে। তখন বিশেষ করিয়া ধরায়, সুরবালা হত্যাপরাধ স্বীকার করে। অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টেও সুরবালা হত্যাপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

জজসাহেব অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন,—

"সে চিঠিগুলির মধ্যে কয়েকখানি পাঠ করিয়া আদালতকে শুনাইতে হইবে।"

পত্র পঠিত হইতে লাগিল।

১ নং পত্র।

"দ্বিজেন্দ্র! দ্বিজেন্দ্র! নিষ্ঠুর! আমাকে আর একবার দেখাটীও দিলে না। কোন্ দেশে চলিয়া গেলে, যদি বলিয়া যাইতে, আমিও না হয় সেই দেশে যাইতাম। লোকে নিন্দা করিত, সমাজে পতিত হইতাম,—তাহাতে কি হইত? আমার প্রাণে কেমন আগুন জ্বলিতেছে, তা ত কেউ দেখে না; কেউ ত তাহার সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করে না! দ্বিজেন্দ্র! তুমি আমার ইষ্ট দেবতা! আমি ইহজীবনে তোমাকে ভুলিতে পারিব না।"

২ নং পত্র।

"দ্বিজেন্দ্র! পূজা আসিয়াছে, যাহার যে যেখানে ছিল, সকলেই বাড়ী আসিল। সকলেই সকলের সকলকে দেখিতে পাইল; তুমি কি আসিবে না? দেখা কি দিবে না?—তোমার জন্য আর কতদিন এমন করিয়া কাঁদিব। দ্বিজেন্দ্র! বাবা জোর করিয়া অন্যের সহিত বিবাহ দিয়াছেন,—আমি কি করিব দ্বিজেন্দ্র! তাতে যদি তুমি রাগ করিয়া থাক,—আমার দোষ কি দ্বিজেন্দ্র? বিবাহ নাই বা হ'ল, কিন্তু দাদার মত, বন্ধুর মত—প্রাণের মানুষের মত, ব্যথার ব্যথীর মত—এক একবার আসিয়া দেখা

দিয়া যাও না কেন? এত অভিমান কেন করিলে দ্বিজেন্দ্র? আমার যে হাত ছিল না, নইলে কি তোমার হইতাম না? আমার যে বড় ইচ্ছা ছিল, তোমার হইয়া—তোমার দাসী হইয়া বড় সুখলাভ করিব।"

৩ নং পত্র।

"দ্বিজেন্দ্র! দেখে যাও,—আমি বড় কষ্টে আছি, আমি তোমাকে ভালবাসি, স্বামী ইহা জানিতে পারিয়াছেন। একদিন আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্র কে? আমি বলিয়াছিলাম—সে আমার ইষ্টদেবতা। স্বামী জিজ্ঞাসিলেন—তুমি তাকে ভালবাস? আমি বলিলাম, ভালবাসা কাকে বলে জানি না। কিন্তু আমার সবখানি দ্বিজেনের পদতলে পড়িয়া আছে। স্বামী আর কথা কহিলেন না। কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি আমাব উপর সম্পূর্ণ বিরক্ত হইয়াছেন। তখন বুঝিলাম, কথাটা বলিয়া ভাল করি নাই,—প্রাণের কথা মুখে বলা, এ জগতে মহাপাপ না কি? যাই হোক—স্বামী অসুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। আমার উপর ঘৃণা ও অত্যাচার করিতে লাগিলেন। সকলই অদৃষ্ট। কিন্তু তুমিও কি একবার দেখা দিবে না?"

জজসাহেবের মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ বিভিন্নাকার ধারণ করিল,—দশবার তিনি রুমালে মুখ মুছিলেন। আর ক্লিষ্টাবিসন্না অশ্রুমুখী সুরবালা মধ্যে মধ্যে হতচেতনা হইতে লাগিল। আদালতগৃহ নিরব নিস্তব্ধ।

সরকারী উকীল ৩ নং পত্রের বলে বলিতে লাগিলেন,—"সম্ভবতঃ এই পত্রগুলি সমস্তই নকল, ইহার আসলগুলি দ্বিজেন্দ্র নামক ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে এবং শেষের পত্রখানি পাইয়া সুরবালার স্বামীর জীবন বিনাশের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে, আরও বলা বাহুল্য, সেই পরামর্শ মাত্রেই এই হত্যাকাণ্ড সুববালার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।"

কিন্তু বিচারকদিগের সে ধারণা হইল না, তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, ইহা হতাশপ্রেমের কবিতামাত্র,—ইহা প্রেমিকের হস্তে পতিত হয় নাই, বা সে জন্য লিখিতও হয় নাই।

তৎপরে সাক্ষী। কিন্তু সাক্ষী এমন একটাও মিলিল না, যাহাতে সুরবালা দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

জজসাহেব টেবিলের দিকে মুখ রাখিয়া সুরবালাকে বলিলেন,—

"দেখ, তুমি হত্যাপরাধ স্বীকার করিতেছ, কিন্তু প্রমাণ নাই।"

সুর। প্রমাণ না থাকিলে আমি কি করিব সাহেব?

জজ। তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ, তাহার দণ্ড জান? তোমার ফাঁসি হইবে।

সুরবালার দুই চক্ষু দিয়া শতধারা বহিল। সে বলিল,—"সাহেব! প্রভু! আমার মৃত্যুই ইচ্ছা। আমার কি আছে যে, তাহা লইয়া সংসারে থাকিব প্রভু? আমার ইষ্টদেবতা দ্বিজেন্দ্র কত দিন হইল, কোন্ দেশে চলিয়া গিয়াছে! যাহার আশ্রয়ে ছিলাম, সে স্বামীও মরিলেন—তবে বাঁচিব কি সুখে প্রভু? আমি মরিব—মিথ্যা কথা কহিয়াই মরিব।

জজসাহেব বলিলেন,—"সুরবালা!"

"সুরবালা।" এমন করিয়া—এমন মধুরস্বরে কে ডাকিল? একি জজ-সাহেব? এ যে সুরবালার প্রাণে গাঁথা কোথাকার এক পুরাতন মদিরা-স্বর। সুরবালা জজসাহেবের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিল—সে মুখের সহিত এ মুখের সাদৃশ্য আছে।

জজ সাহেব বলিলেন,—"সুরবালা। তুমি মিথ্যা বলিও না, হলফ পড়িয়াছে, সত্য বল। মিথ্যা কথা বলিলে মহাপাপ হইবে।"

শ্মশানে লজ্জা থাকে না। সুরবালা দমে দমে নিশ্বাসে নিশ্বাসে বলিল, "মিথ্যা বলিলে পাপ হয়, আমি তাহা জনি, কিন্তু আমার বাঁচিয়া সুখ নাই,—আত্মহত্যা মহাপাপ, তাই মিথ্যা বলিয়া মরণের পথ খোলসা করিতেছি।"

জজ। ইহাও আত্মহত্যা। জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলিয়া মরণের পথ পরিষ্কার করিলেও আত্মহত্যার পাতক হয়।

সুরবালা। তবে মিথ্যা বলিব না, আমি আমার স্বামীকে হত্যা করি নাই। তিনি আমার প্রণয়ে হতাশ হইয়া গোপনে বিষ খাইয়া মরিয়াছেন।

জুরিগণের সহিত জজসাহেব ইহাই সত্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং সুরবালার বিপক্ষে কোন প্রমাণ না পাইয়া, সুরবালাকে নির্দ্দোষ বলিয়া অব্যাহতি দিলেন।

সুরবালা আদালত হইতে বাহির হইল। যতক্ষণ জজসাহেবকে দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ সে ফিরিয়া তাঁহার পানে চাহিতে লাগিল। সুরবালা অনেক দূর চলিয়া গেল,—সহসা জজসাহেবের মূর্চ্ছা হইল।

সুরবালা বাহির হইবামাত্র কতজনে তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"এখন যাও যাদু, নিষ্কণ্টকে মজা মারগে।" কেহ

বলিল, "আমাদের পছন্দ হয়?" কেহ বলিল, "ভাল ফস্কানই মেরেছিস্?" সুরবালা ঘৃণায় লজ্জায় অভিমানে মরিয়া গেল।

সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়ায় যখন পৃথিবী ম্লানমুখী হইলেন, সেই সময় সুরবালা জেলার বাহিরের রাস্তার ধারে ঘোষের দীঘির পাড়ে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, 'আর প্রাণ রাখিয়া কি করিব? সমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না, লোকে ঘৃণা করিবে—তবে আমার মরণই মঙ্গল, ঐ দীঘির শীতল জলে প্রাণের জ্বালা জুড়াই।' সুরবালা আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না। দীঘির উচ্চ পাড় হইতে সেই গভীর জলে পড়িল। জলরাশি একবার উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত হইয়া নীরবে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিল।

রাত্রি দশটার সময় জজসাহেবের শরীর সুস্থ হইল, তখনই তিনি সুরবালাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন।

পরদিন বেলা সাতটার সময় সংবাদ আসিল, সুরবালা ঘোষদীঘির জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

জজসাহেব গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং বাহিরের লোকে শুনিতে পাইল, কটাস্ করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল—জজ সাহেবের প্রাণ উড়িয়া গেল।

জজসাহেব দ্বিজেন্দ্র। দ্বিজেন্দ্র বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিলাত যায়, সেখানে গিয়া সিভিলিয়ান হইয়া দেশে আসে এবং ক্রমে এই রাজকীয় পদ লাভ করে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত দ্বিজেন্দ্র বিবাহ করে নাই।

সুরবালার স্বামী সুরবালাকে লইয়া এই দূর দেশে অবস্থান করিতে-ছিলেন বলিয়া, সুরবালা সে সন্ধান পায় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।



প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীমতি রাণী ভবসুন্দরী দেবীর শুভ জন্মদিনে.

ভক্তি-উপহার।

বসন্ত-বাসরে, দিগন্ত-আসরে
অগণ্য তারার মেলা;
রতন আসনে, মোহন হাসনে,
রজত চাঁদের খেলা।
জ্যোছনা বসনা, নয়ন তোষণা,
প্রকৃতি-অধরে হাস;
হীরক পুঞ্জীত, চৌদিক রঞ্জিত,
ধরায় হরষ-ভাষ।
মঞ্জুল ভুবন, মৃদুল পবন,
প্রাণে আকুল তুফান,
কোকিল-কূজনে, মধুপ গুঞ্জনে,
দিগ্‌বধূ ব্যাকুল প্রাণ।
প্রফুল্লনয়ানে, শশীরে আহ্বানে,
কুমুদিনী সব বুকে;
ঈর্ষায় জ্বলিয়া, অধীর পাপিয়া,
'চোক গেল' বলে মুখে।
ধরণী সুন্দরী, সুষমা-ঈশ্বরী,
এ ধরার সম্ভোগে.
অবনী মাঝার, জনম তোমার,
হেন মনোহর যোগে।
প্রবৃত্তি নিচয়, তোমার হৃদয়,
তাই সবই সুন্দর,
দীনের রোদনে, প্রাণের বেদনে,
সদা ব্যথিত অন্তর।
অভুক্ত বদনে, ভোজন প্রদানে,
তুমি অন্নপূর্ণা মাতা
দরিদ্র জীবনে, শান্তির কারণে,
গঠেছে তোমায় ধাতা।
ভীষণ আঁধারে, জীবন-আধারে,
মূর্ত্তি তব ধ্রুবতারা;
হৃদয়-কন্দরে, সভক্তি অন্তরে,
পূজে তাই তোমা' তারা।
কুটিরে ছখীরা, বাহিরে পাখীরা,
গাহে তব কীর্ত্তি-গাথা;
জগত পূরিত, মানব মোহিত,
বিমিশ্র সে-গীতি-বার্তা।
মূরতি যতনে, গঠিত পাষাণে,
হ'বে সবে কালে লুপ্ত,
দয়ার কীর্ত্তন, তোমার কথন,
হ'বে নাক দেবী সুপ্ত।
জনম দিবসে, প্রাণের হরষে,
এনেছি অযোগ্য দানে,
স্নেহের চাহান, দীনের জননী,
চাহ (মা) অভয় নয়ানে।
যেন গো নিরাশ, করে না বিনাশ,
মম কণিকা বাসনা,
লহ গো আদরে, ভক্তি-উপহারে,
মাখা প্রাণের কামনা।
মনের উল্লাসে, বিভুর সকাশে,
যাচি তব জন্মদিনে,—
সুদীর্ঘ জীবন, করিয়া ধারণ,
পালহ দরিদ্রগণে।

শ্রীগুণেন্দ্রনাথ রায়

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

গয়নার নায় * মোরা বসি দশ বার জন,
হইতেছে দিল্লী টিল্লী বাদ্‌সা-বধ অগণন।
হেনকালে ঘোর ঝড় ঘেরে নৌকা আচম্বিত,
ভীষণ বুয়র সৈন্য ঘেরে যথা লেডীস্মিথ্।
কেউ 'দুর্গা' কেউ 'আল্লা' কেউ বলে 'হরি হরি',
মাঝি মাল্লা প্রাণপণে বহিলেক হা'ল্ ধরি।
আমাদের একজন সকাতরে কেঁদে কয়,
"আমার তো সহরেতে আজি না গেলেই নয়।
কাছারী থাকিতে যদি না যাইতে পারি, খাটা,
ষোলশ টাকাই মোর একেবারে হয় মাটী।
হাজার টাকার খৎ—আজি ম্যাদ চলে যায়,
দুর্গতিনাশিনি দুর্গে! রক্ষা কর এ যাত্রায়।
এবার করিব পূজা যোড়া পাঁঠা বলি দিয়া,—
যথাকালে সহরেতে দাও মোরে পৌছাইয়া।"
কি জানি বিধির লীলা, সহসা থামিল ঝড়,
সহরে পৌঁছিয়া মোরা গেনু যে যাহার ঘর।
পরদিন রাজপথে দেখা হ'ল দুজনায়,
সে-ই কহে ডেকে, "ডিক্রী পাইয়াছি মামলায়।"
তামাসার ছলে আমি তাহারে কহিনু হেসে,
"দুটো পাঁঠা একেলাই খাবেন্ ঘরেতে বসে?"
সে কহে, "আপনি দেখ্‌ছি অতি সোজা কলিতে,
সত্যি কি দুর্গারে আমি যাচ্ছি যোড়া পাঠা দিতে?
সে দেখায়ে ছিল ভয়, আমি দেখায়েছি লোভ,—
শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—কারো মনে নাহি ক্ষোভ।"

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,

* Ferry Boatকে পূর্ব্ব বঙ্গে "গয়নার নৌকা" (বা "গয়নার নাও") বলিয়া থাকে। বোধ হয় "গমনের নৌকা" হইতে "গয়নার নৌকা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুরের
শুভ জন্মদিন উপলক্ষে লিখিত।

উপায়ন।

দীন কোথায় কেমনে,
পা'বে রজত কাঞ্চনে,
পূজিতে প্রভু এ জনম দিনে তোমায়?
তাই অতি নিরজনে,
বসিয়া আপন মনে,
গেঁথেছি এ উপহার-মালা আকাঙ্ক্ষায়।
সুবর্ণ মুক্তা মানিক,
হীরক মতি স্ফটিক,
কিম্বা মূল্যবান কিছু নাহি এ মালায়।
তাই বলি দীন-দান,
করিও না প্রত্যাখ্যান,
হেস না ঘৃণা-হাসি ডুবায়ে নিরাশায়।
অতুল ধনাধিপতি,
জন্ম লভি নরপতি,
মুছাইতে দরিদ্রের নয়নের বারি।
তুমি দয়া মূর্ত্তিমান,
অকাতরে করি দান,
লভিয়াছ এ ধরায় নাম দুখহারী।
তাই বড় আশা করে,
আজি উপায়ন তরে,
এনেছি আমি এ মালা,—ধর ধর প্রভু।
দিয়া দীরঘ জীবন,
সদা পুলকিত মন,
রাখুন তোমায় দেব সুস্থ দেহে বিভু।

পুবিবে বাসনা মোর,
দীনেব আশাব ঘোর,
হেরি' বিভীষিকাস্ত ভাঙিবে না স্বপনে।
সবে প্রফুল্ল পরাণে,
সদা গা'বে উচ্চতানে,
যশোগীতি তব দেব, অতুল ভুবনে।

শ্রীগুণেন্দ্রনাথ রায়।

মাসিক সংবাদ।

নূতন মুদ্রা।—এবার বাজারে টাকার বড়ই অনাটন শুনা যাইতেছে, তাই সবকাবী টাঁকশালে সুতের লক্ষ নূতন টাকা প্রস্তুত হইবে। পুবাতন টাকা অর্থাৎ ১৮৪০ সালেব টাকা আব চলিবে না। সেই জন্য ঐ সালেব প্রায় এক কোটী টাকা তহবিলে মজুত, তাহা ভাঙ্গিয়াই নূতন টাকা প্রস্তুত হইবে।

সিগারেটের অপকারিতা।—"ল্যান্সেট" নামক পত্রিকায় সিগারেটের অপকারিতার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। সিগারেট টানিবার সময় ধোঁয়া নাসারন্ধ্রেব ভিতর দিয়া ফুস্ ফুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, উহাতে নানাপ্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে, সিগাবেট-সেবনাভিলাষীগণ সাবধান।

নূতন পোষ্ট অফিস।—হাওড়া হেড পোষ্ট অফিসের অধীনে আর দুইটী নূতন পোষ্ট অফিস হইবার কথা হইতেছে। শীঘ্র বোধ হয়, ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। হাওড়া হেড পোষ্ট অফিসের বড়কর্ত্তা মিষ্টার জে, ইয়াকজী সাহেব মহোদয় অতিশয় কার্য্যদক্ষ এবং অমায়িক প্রকৃতিসম্পন্ন, ইঁহার সুবন্দোবস্ত গুণে অফিসে কখন কোনও গোলযোগ হয় নাই। অফিসের কর্ম্মচাবীগণও কর্ত্তব্যপরায়ণ, সাধারণের প্রতি তিনি কখনও কোনরূপ অত্যাচার করেন না। পোষ্টমাষ্টার ইয়াকজী মহোদয় সকল কার্য্য বিশেষ যত্নের সহিত নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।

একশিরার মাদুলী।—আমরা এই নামে একটী মাদুলী উপহার পাইয়া জনৈক বন্ধুকে উহা ধারণ করিতে দিই, ইহা ধারণে বন্ধুটীর বহুদিনের স্থায়ী রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়া, আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। যাঁহারা উক্ত রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা অকপটচিত্তে ঐ মাদুলী ধারণ করিতে অনুরোধ করি। বাবু ভূপেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের নিকট, জেলা নদীয়া, জুলিয়াদহ পোষ্ট অফিস—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাওয়া যায়; খরচ কেবলমাত্র ।/৫ আনা।

উৎসব।—বিগত ১৩ই বৈশাখ হাওড়া ডোমজুরে শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে বঙ্গবান্ধব সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ স্বামী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

নূতন মাসিক।—আমরা যমুনানাম্নী একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা উপহার পাইয়াছি। প্রথম সংখ্যা পাঠে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে "যমুনা" পরিচালন কার্য্য ভালই হইবে—এরূপ আশা করা যায়। সহযোগীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তি-স্বীকার।—আমরা "মণ্ডল" দাস কোম্পানীর এক শিশি "প্রফুল্ল" তৈল উপহার পাইয়াছি। ইহার দ্বারা মাথাধরা, হাত পা জ্বালা প্রভৃতির আশু উপকার হয় এবং প্রফুল্লের মনোহর গন্ধে মন প্রাণ প্রফুল্ল হয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আট আনা। আমরা অল্পমূল্যে সকলকে এই তৈল ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

চিত্রালয়।—কলিকাতা চোরবাগান আর্টষ্টুডিও দ্বারা প্রস্তুত এলম্যানাক চিত্র আমরা নানা স্থান হইতে উপহার পাইয়াছি; ইহাঁদের চিত্রিত ছবি সকল দর্শনযোগ্য এবং অতীব পরিপাটীরূপে প্রস্তুত। আমরা এই চিত্রালয়ের ক্রমোন্নতি দেখিলে সুখী হইব।

বারয়ারী।—হাওড়ার অধীন সাঁত্রাগাছি গ্রামের বারয়ারী চিরপ্রসিদ্ধ; বিগত ২৮শে বৈশাখ পূর্ণিমার দিবস উক্ত বারয়ারীর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এমন নয়নমনোহর "রামসীতার" প্রতিমূর্ত্তি অন্য কোথাও হয় না। প্রতি বৎসর দেশবিদেশ হইতে প্রতিমা দেখিবার জন্য অসংখ্য যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি, অন্যান্য স্থানের বারয়ারী অপেক্ষা এখানকার বন্দোবস্ত অতি চমৎকার এবং পাণ্ডাগণ সকলেই ভদ্রলোক।

সমালোচনা।

হেমচন্দ্র—উপন্যাস। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। বঙ্গের অমর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমবাবুর "মৃণালিনী"র উপসংহার-রূপে এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে।

মৃণালিনীর উপসংহার লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মৃণালিনী পুস্তক পাঠ সমাপ্ত করিয়া আর কোন্ বিষয় জানিবার জন্য পাঠকের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। বঙ্কিমের নামের সঙ্গে নিজের নাম সংযোজনা করিয়া পুস্তকের অধিক কাট্‌তি করিবার ইচ্ছা—ইহাই যদি কারণ হয়, তবে সুরেন্দ্রবাবুর ন্যায় শক্তিশালী লেখকের পক্ষে তাহা ভাল হয় নাই—একথা আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি। জানি—চন্দ্র, সূর্য্যের কর গ্রহণ করিয়া অত প্রোজ্জ্বল, কিন্তু তথাপি চন্দ্রকে সূর্য্যের নামে পরিচিত হইত হয় না। সুরেন্দ্র বাবুর নিজের নামেই পুস্তকের কাট্‌তি অজস্র। তাঁহার লিখিত পুস্তকের মধ্যে কোন কোন পুস্তকের আট দশ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে ইহা কম গুণ-গরিমার কথা নহে। যদি হেমচন্দ্রকে বঙ্কিমের পতাকামূলে না জুড়িতেন, আমাদের বিশ্বাস, ইহার মৌলিকত্বে বাহার আরও খুলিত। বঙ্কিমের কাছে ইহার উপাদান কিছুই পান নাই, সুরেন্দ্রবাবুর নিজ হৃদয়ের অপূর্ব্ব কল্পনারই ইহা ক্রীড়নক।

এই পুস্তকের ভাষা, [illegible] চরিত্র-চিত্রণ এতই মধুর হইয়াছে যে, পাঠ করিতে করিতে ভাবিতে হয়—আমরা অন্য বিষয়ে যতই কেন হেয় হই না—এখনও আমাদের বঙ্গমাতা সুরেন্দ্রবাবুর ন্যায় সুকবিকে প্রসব

করিতেছেন। এখনও এমন ভাবের হৃদয় এদেশে আছে। যখন যে রসটির বর্ণনা করিয়াছেন, তখনই তাহা যেন ফুটিয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমের হেমচন্দ্রে আর সুরেন্দ্রবাবুর হেমচন্দ্রে একটু পার্থক্য আছে বলিয়া অনুমিত হয়। বঙ্কিমের হেমচন্দ্র কতকটা যেন নির্জ্জীব সুতরাং প্রথম সংস্করণের, আর সুরেন্দ্রবাবুর হেমচন্দ্র দ্বিতীয় সংস্করণের, কাজেই পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। শ্যামার হতাশপ্রণয়ের চিত্র অতি মধুর, পুস্তকের পাঠ সমাপ্ত করিলেও শ্যামার স্বর কর্ণে বাজে। শিশির-মাথা রজনীর কোলে দাঁড়াইয়া সুরেন্দ্র-বাবুর হতাশ প্রণয়ের চারুপ্রতিমা শ্যামা গাইতেছ,—

"আমি মরি মরি তবু মরিতে পারি না,
আছি জীবনে মরণে মিশা'য়ে,
তুমি স্বপনে পরাণে দেখা দিয়ে,
পুন জাগরণে যাও মিশায়ে।
স্মৃতিটুকু শুধু মোরে দিয়ে যাও,
মরি তাই লয়ে কাঁদিয়ে।
নিমেষের তরে কেন এস তবে
জান যদি যাবে চলিয়ে।
নয়নের কোণে নিরাশার বারি
নিশি শেষে পড়ে ঝরিয়ে,
আমি স্বপনে তোমায় দেখা পাই ব'লে
তাই মরণে রেখেছি বুঝায়ে।"

চরিত্র সৃষ্টি, রসের অবতারণা, বর্ণনার চাতুর্য্য, আখ্যানের মনোজ্ঞতা এবং অলঙ্কারের কৌশল হেমচন্দ্রে যাহা আছে—তাহা বঙ্কিম মরিয়া আর কাহারও গ্রন্থে দেখি নাই—সুরেন্দ্রবাবুর লেখনীতে ফুল চন্দন পড়ুক! তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।



সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নিবেদন।—আমাদের উপহার পুস্তক সমস্তই মুদ্রিত হইয়াছে। এখনও যাঁহাদের নিকট হইতে বার্ষিক মূল্য পাওয়া যায় নাই, তাঁহারা সত্বর বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা পাঠাইয়া উপহার গ্রহণ করুন। এবার উপহারের চারিখানি উপন্যাস অতি উপাদেয় হইয়াছে। দিন থাকিতে গ্রহণ না করিলে নৈরাশ হইবার সম্ভাবনা—অতএব সকলে সত্বর হউন।

আলোচনা সমিতি ও ব্যাটরা চতুষ্পাঠী।—আজ কয়েক বর্ষ হইল, হাওড়ার অন্তর্গত ব্যাটরা গ্রামে উক্ত সমিতি ও চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্যাটরা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত কয়েকটী ছাত্রকে অন্নদান ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। এবার তাঁহারই প্রগাঢ় যত্নে একটী ছাত্র কলিকাতার পণ্ডিত সভা হইতে আদ্য পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। এতদঞ্চলে এরূপ সাধারণ হিতকরকার্য্যে কাহারও সহানুভূতি নাই। তবে হাওড়ার স্বনামধন্য য়িহুদী ধনকুবের মাননীয় আই, আর, বিলিলিয়াস সাহেব মহোদয় চতুষ্পাঠীকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য বিশেষ সাহায্য করিতেছেন; শুনিয়াছিলাম, তিনি ইহার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। সাহেব মহোদয় এরূপ কার্য্যে বিশেষ যত্নশীল, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ। ভগবান এই পরহিতব্রত মহাত্মাকে দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। ব্যাটরার পরদুঃখকাতর ধার্ম্মিক প্রকৃতি ৺উমাচরণ কুণ্ডু মহাশয়ের কৃতী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু বামাচরণ কুণ্ডু মহাশয়ও চতুষ্পাঠীর সাহায্যার্থে অকাতরে দান করিয়া থাকেন। পরলোকগত মহাত্মা উমাচরণ কুণ্ডু মহাশয়ের ন্যায় পরদুঃখকাতর দানশীল হাওড়া জেলায় আর কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে তিনি অরণ্য-কুসুম, অরণ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াই অরণ্যে শুখাইয়া গেলেন, ভগবান তাঁহাকে বেশী দিন এ কার্য্যে ব্রতী রাখিলেন না। আমরা তাঁহার যে সকল দানের পরিচয় পাইয়াছি—তাহা অতি অদ্ভুত; বামাচরণ বাবু তাঁহারই ভ্রাতা হইয়া যে এরূপ সাধারণ হিতকরকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিবেন—তাহাতে

আর বিচিত্র কি ? আমরা অন্তরের সহিত তাঁহার উন্নতি কামনা করি। এক্ষণে প্রার্থনা আলোচনা সমিতি ও আলোচনা পত্রিকাখানি আজ ছয় বৎসর হইল, এখান হইতে প্রকাশিত হইতেছে, বঙ্গের যাবতীয় রাজন্যবর্গ ইহার পৃষ্ঠপোষক এবং হাওড়ার ন্যায়বান বিচারপতি ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর আলোচনা পত্রিকাখানিকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এক্ষণে উক্ত মহাত্মাদ্বয় আলোচনা সমিতি ও আলোচনা পত্রিকাখানির প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলে আমরা সাতিশয় উৎসাহিত হইব।

প্রাপ্তি স্বীকার।—আমরা হারি কোম্পানীর এক শিশি চিকুরবিলাশ তৈল উপহার পাইয়াছি—উহার গন্ধ অতি মনোহর ও বহুক্ষণ স্থায়ী। ৫।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ঐ তৈল পাওয়া যায়—সাধারণে একবার পরীক্ষা করিলে জানিতে পারিবেন।

"হরিনামে বিশ্বাস ও নির্ভর।"

এ ধরাধামে এমন কোন পদার্থ আমাদের অবলম্বন করা উচিত, যাহা করিলে আমরা অন্ধ হই—আমাদের চক্ষু দান করিবে; আমরা পঙ্গু হই—আমাদের গতি শক্তিদান করিবে; আমরা রোগী হই, আমাদের আরোগ্য দান করিবে; বিষয়ানুরাগী হই, বৈরাগ্য দান করিবে; অভাগা হই, আমাদের সৌভাগ্য দান করিবে, পাপী হই, পুণ্যবান্ করিবে। যে বস্তু ক্লান্তিকালে শান্তিদান করিতে সক্ষম, ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, আমরা দুর্ব্বল কলির জীব, আমাদের সেইরূপ বস্তুই অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু জগতে এমন বস্তু কি আছে? জগদ্‌গুরু মহেশ্বর বলিয়াছেন, সে বস্তু জগতে একমাত্র আমার প্রাণের প্রাণ, প্রেম পারাবার পতিতপাবন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নাম। অন্ধের অন্ধত্ব দূর করিয়া, অন্ধকে দিব্য দৃষ্টি প্রদানে পরমব্রহ্ম শ্রীহরির প্রেমময়মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া দেয়, হরিনাম ভিন্ন এ ক্ষমতা এ জগতে আর কোন্ বস্তুর আছে? তাহার প্রমাণ অন্ধ বিল্বমঙ্গল যখন বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে, কাননে কাননে 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' করিয়া কাঁদিয়াছিল, তখন সেই অন্ধের অন্ধত্ব দূর করিয়া কে তাহাকে শান্তিদান করিয়াছিল? একমাত্র শ্রীহরির নাম। বিল্বমঙ্গল ধ্যানে কৃষ্ণদর্শন পান নাই, সাধনে দর্শন পান নাই, কেবল একমাত্র শ্রীহরির নামাবলম্বনেই সেই

পরম পুরুষের দর্শন পাইয়াছিলেন। তবেই দেখুন, অন্ধকে দর্শনশক্তি দিবার ক্ষমতা হরিনামে আছে কি না? যে অচল চলচ্ছক্তিহীন, সেইত পঙ্গু। হরিনামের বলে সেই পঙ্গু দিব্য চলচ্ছক্তি প্রাপ্ত হইয়া, পরমধামে গমন করিতে সক্ষম হয়। তাহার প্রমাণ পক্ষিরাজ সম্পাত। বিহঙ্গরাজ পক্ষবিচ্যুত হইয়া গিরিগহ্বরে যখন মৃতপ্রায় হন, সেইকালে সুমধুর হরিনাম শ্রবণ করিবামাত্রেই পক্ষপ্রাপ্ত হইয়া দিব্যালোক বৈকণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন। এ ভবে যত রোগ আছে, সামান্য ঔষধেই জীবকে সেই রোগ হইতে আরোগ্য করিতে পারে, কিন্তু ভাই! এই ভবরোগ হইতে নিস্তার করিবার একমাত্র ঔষধই সেই হরিনাম। তবেই বলিতেছি, আমি অন্ধ হই—হরিনাম আমাকে চক্ষুদান করিবে, আমি পঙ্গু হই—হরিনামই আমাকে গতিশক্তি দান করিবে, আমি রোগী হই—হরিনামই আমাকে আরোগ্য দান করিবে। জীবকে বিষয়ানুরাগী দেখিয়াই ত চিত্তহারী চিন্ময়রূপী চৈতন্যচন্দ্র এ জগতে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া, হরিনাম সুধাদানে জীবের বিষয় বিষকে হরণ করিয়াছিলেন, পাষণ্ড প্রাণকে প্রেমের পাথারে ভাসাইতে, প্রেমে পাগল করিতে, প্রেম পদার্থে পরিণত করিতে একমাত্র হরিনাম। হরিনাম গুণে কঠিন অভিমানী ক্রূর ব্যক্তিও কোমলতায় পরিপূর্ণ হইয়া দীনতার আদর্শ মূর্ত্তিতে এ জগতে প্রকাশ করিতে পারেন। পাপপঙ্কে মলিন ব্যক্তিও হরিনামগুণে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া পরম পবিত্রভাবে এ জগতে প্রকাশ করিতে পারেন। তাই বলি, কঠিনকে কোমল করিতে, মলিনকে নির্ম্মল করিতে, চোরকে সাধু করিতে সেই হরিনামেরই ক্ষমতা। যে নাম একদিন পঞ্চাননের পঞ্চমুখ হইতে নির্গত হইয়া গোলোকে গবিন্দকে গলাইয়া গঙ্গার অবতরণা করাইয়াছিলেন,—যে নাম একদিন নারদের মুখ হইতে নির্গত হইয়া গোলোকে গোবিন্দকে গলাইয়া গঙ্গার অবতরণা করিয়াছিলেন,—যে নাম একদিন নারদের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া কঠিন চিত্ত ক্রূর রত্নাকরকেও কোমল করিয়াছিল, এই কলিযুগে সেই জগত-মাতান হরিনামই আমাদের একমাত্র উপায় বা অবলম্বনীয়। এই প্রাকৃতিক জগতে আমাদের কাছে বস্তু সকল যেরূপ আদরণীয়, বস্তু সকলের নামও তদ্রূপ আদরণীয়, কেন না, বস্তু লাভ করিবার উপায়ই তাঁহার নাম, বরং বস্তু অপেক্ষা বস্তুর নামের নিত্যতা আমরা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকি। এই পৃথিবীতে কত বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, আবার লয় হইতেছে, আমরা স্থূলদৃষ্টিতে তাহা সচরাচর দর্শন করিতেছি। বস্তু লয় হয়, কিন্তু বস্তুর নাম কখন লয় হয় নাই। এ

জগতে নামের নিত্যতা আছে বলিয়াই ত আজ কত দিন হইল, পরম ভক্ত প্রহ্লাদ গোলোকে গমন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপিও তাঁহার নাম আমরা শুনিতে পাইতেছি এবং তাঁহার বৃত্তান্ত শ্রবণে বুঝিতে পারিতেছি যে, কৃষ্ণনাম যাঁহার সম্বল, যত বিপদই আসুক না কেন, তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। প্রহ্লাদ হরিনাম-বলে কত বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, হরিনাম পরিত্যাগ করাইবার জন্ম তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে কত উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু প্রহ্লাদ প্রাণের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া, পিতৃবাক্য লঙ্ঘনে অধর্ম্মের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া, নামানন্দে বিভোর হইয়া, হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে অনলে ঝাঁপ দিয়াছেন,—দগ্ধ হন নাই, মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, নিমজ্জন নাই। এমন কি, গরলকেও অমৃত করিয়াছিলেন। সুধা-খনিতে যাহা পতিত হয়, তাহাই যে সুধা হইয়া যায়! হরিনাম সুধাসাগরে কেন না, ভক্ত প্রহ্লাদের হরিনামভরামুখে বিষও সুধারূপে পরিণত হইয়াছিল। হরিনাম-বলেই মহাদেব সমুদ্রোত্থিত গরলরাশিকে কণ্ঠে স্থান দিয়া নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাই বলি, এ সংসারে হরিনামই সার। ভগবান নামের মহিমা জানাইবার জন্ম জগতকে নামময় করিয়াছেন। তাই বলি, নামই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুতরাং ভাই, এমন সুধাময় নাম কি ছাড়িতে আছে? আজ তোমাকে তপস্যা করিতে হইবেক না, সাধনা করিতে হইবেক না, উৎকট নিয়মে দেহ ক্লিষ্ট করিতে হইবেক না, সেই শ্রীহরির নাম অবলম্বন করুন, অবশ্যই দয়াময়কে প্রাপ্ত হইবেক সন্দেহ নাই।

চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে পড়িয়াছি, কলিযুগে "যেই নাম, সেই কৃষ্ণ, ভজনিষ্ঠা করি। নামের সহিতে আছেন আপনি শ্রীহরি।"

লৌহের মলিনত্ব নাশ করিতে একমাত্র উপায় যেমন অগ্নি, কমলকে প্রস্ফু-টিতও করিতে যেমন একমাত্র দিবাকর সক্ষম, এ জগতকে সুধাদানে শীতল করিতে যেমন একমাত্র সুধাকর, সেইরূপ কলি-কলুষিত জীবকে উদ্ধার করিতে একমাত্র হরিনামই মহামন্ত্র, যেমন মহাপাপী জগাই মাধাইকে হরিনাম-বলে দয়াল নিতাই উদ্ধার করিয়াছিলেন, আবার নামের গুণ জানিয়াই ত পাণ্ডবেরা বিষম বিপদে পতিত হইয়া আপন আপন পরাক্রম সত্ত্বেও স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ না করিয়া, সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নামাশ্রয় করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, ভগবানের নামের বলই পরম বল, তাই ত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে কুরুসভায় ইন্দ্রতুল্য পঞ্চস্বামী উপস্থিত থাকিতেও

তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, ভগবানের নামাশ্রয় করিয়াছিলেন; দুর্ব্বাসা অতিথি হইলে অন্য উপায় না দেখিয়া, কাম্যকানন মধ্যে পাণ্ডবকামিনী কৃষ্ণা কাতরপ্রাণে শ্রীকৃষ্ণের নাম করিয়া কাঁদিয়াছিলেন, ভগবান আপনার নামে আপনি বিভোর হইয়া দ্রৌপদীর দগ্ধহৃদয়ে শান্তিসুধা সিঞ্চনের জন্য সেই গোলোকবিহারি গোবিন্দ গভীর নিশীথে রুক্মিণীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গহন কানন মধ্যে দ্রৌপদীকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাই বলি ভাই, ভবনে কাননে সকল স্থানে সর্ব্ব সময় ভগবানের নাম লইয়া দুর্লভ মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

নভোমণ্ডলে নবীন নীরদ জালে চপলা চমকিত হইলে সেই চপলা চমক দর্শন করিয়া, চাতকচিত্তে কি ভয়ের সঞ্চার হয়? হয় না কেন? মেঘের প্রতি চাতকের যে বিশ্বাস ও নির্ভর, সে জানে, মেঘ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সেই মেঘই আবার বারি বর্ষণ করিয়া তাহার পিপাসা নিবারণ করিবে। কেবল বিশ্বাসবলেই চাতককুল অশনি নিনাদ শ্রবণে ভীত হয় না এবং হতাশ হইয়া জলের জন্য মেঘ ব্যতীত অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে না। তাহারা সরোবরের কাছে জল চায় না। নদীর কাছে এমন কি অগাধ জলধি যে সমুদ্র, তাহার কাছে জল চায় না, কেবল একমাত্র যেমন দৃষ্টি মেঘের প্রতি। অতএব হরিনামের মহিমা অনন্ত মহিমা, সে মহিমা চিরকালের জন্য জগতে সমভাবে রহিয়াছে, যুগে যুগে তারকব্রহ্ম নামই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

শ্রীতারিণীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভক্তের ভগবদ্ভক্তি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় স্তবক।

আশ্বিন মাস। শরৎ ঋতুর আগমনে, ধরিত্রী দেবী অভিনব বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া, অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন। আকাশমার্গ সুনির্ম্মল, মেঘ-রেখা পরিশূন্য। জলধর পটলের প্রবল্প প্রভুত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে, বিশ্ববিকম্পী বিকট বজ্র নির্ঘোষ, আর কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয় না। পথ, ঘাট সমুদায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোথাও পঙ্ক ও কর্দ্দমের লেশ মাত্র নাই।

দীঘি, তড়াগ ও সরোবর সমূহের সুনির্ম্মল জলে কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ ও রক্তোৎপল সমূহ ঘরে ঘরে বিকসিত হইয়া, পরম রমণীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মা আনন্দময়ী আসিতেছেন, সেই আনন্দেই বুঝি বসুধার এই অভিনব বেশ পরিগ্রহ। ভাগীরথীর এক্ষণে আর সেই ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি নাই; সেই দুকূলপ্লাবিনী দুর্নিবার প্রবল প্রবাহ, সেই উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ, সেই স্রোতাবর্ত্ত সঞ্জাত ভীষণ কুলু কুলু ধ্বনি, সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে। তাঁহার গৈরিক-রঞ্জিত জলরাশি ক্রমশঃ সুপরিষ্কৃত ও নীলিমাভ হইয়া আসিতেছে; ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সপত্নীর আগমন আসন্নপ্রায় হওয়ায়, এবং তাঁহার তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ বর্ণের তুলনায়, স্বকীয় কান্তি নিশ্চয়ই হীনপ্রভ হইবে, এই ক্ষোভে হৃদয়ে দারুণ ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠায়, এই দশা বিপর্য্যয়।

অপরাহ্ণ। রাম নগরের কুলরমণিগণ, কলসী কক্ষে গ্রাম সন্নিহিত গঙ্গায় জল লইবার জন্য আসিতেছেন, কেহ কেহ বা জল লইয়া প্রস্থান করিতে-ছেন,—কাহারও গতি দ্রুত, কেহ কেহ বা মন্থরগামিনী! যাঁহাদের সংসারে কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট বেশী, তাঁহারাই শীঘ্রগতি, যাঁহাদের কাজ কর্ম্ম কম, অথবা যাঁহারা নিষ্কর্ম্মাগোছের, তাঁহারাই নানারূপ খোসগল্পে গজেন্দ্র-গামিনী। ঘাটের অনতিদূরস্থ প্রান্তরে, কতকগুলি প্রৌঢ়া রমণী শৌচক্রিয়ায় উপবেশন করিয়া, একটা মহা মজলিসের অবতারণা করিয়াছেন। অদ্য কাহার বাড়ীতে কি কি পাক হইয়াছিল, কাহার কোন্ কোন তরকারীটি খাইতে কেমন হইয়াছিল, কাহারও জামাই আসিয়াছেন—সে জন্য তাঁহাকে কি কি আয়োজন করিতে হইয়াছিল, রামকৃষ্ণ মুখুয্যের বৌটি পরমাসুন্দরী বটে, কিন্তু রংটা বড্ড ফ্যাকাসে! আর একটু ময়লা হ'লে দেখ্‌তে মন্দ হ'ত না, গোপেশ্বরের বৌটিও বড় মন্দ নয়; তবে, চোক দুটো যেমন টানা টানা, তেম্‌নি ডাগর ডাগর! আর একটু ছোট খাট হ'লেই ঠিক মানান-সই হ'ত! কাহার স্বামী কা'কে কেমন ভালবাসে, কা'র স্বামী কেমন চাকুরে,—মাসে কত টাকা মাইনে পায়, কার অলঙ্কারখানি, দেখ্‌তে কেমন, কয় ভরি সোণায় তৈয়ার হ'য়েছে—সোণাটা পাকা বটে কি না, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক আলোচনা, স্রোতের মত চলিয়া যাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে বেলা অবসান হইয়া আসিল। গৃহলক্ষ্মীগণও অগত্যা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মাঠ ঘাটের মজলিস ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। গঙ্গা-

গর্ভও ক্রমে নির্জ্জন হইয়া উঠিল। এমন সময় আর দুইটি যুবতী, ঘাটে আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অবগুণ্ঠনবতী এবং অপরটি অনবগুণ্ঠিতা। অনবগুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকটির নাম কমলমুখী, অপরটি কমলমুখীর ভ্রাতৃজায়া নাম বিমলাসুন্দরী। যুবতীদ্বয় পরস্পর অকৃত্রিম প্রণয়ে আবদ্ধ,—যেন, দু'টি দেহে এক প্রাণ। কমলমুখী, বিমলাসুন্দরীকে বৌ-দিদি বলিয়া ডাকিতেন। ঘাট জনশূন্য দেখিয়া, যুবতীদ্বয় পরস্পর মনের অর্গল উন্মোচন করিয়া, নিম্নলিখিত মত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।—

কমল। নে ভাই, ঘোম্‌টাটা একটু তোল? তোর ভাই, লজ্জা দেখে হাসি পায়,—পাঁচ বছরের খোকাটি হ'তে একশো বছরের বুড়টি পর্য্যন্ত যা'কে দেখিস্‌, অম্‌নি দশ হাত ঘোমটা! এখন আর ঘাটে কেউ নাই যে, তোর মুখের ছাঁচ্‌টা তুলে নেবে।

বিমলা। আচ্ছা ঠাকুরঝি! তুই কি ভাই, শ্বশুর বাড়ী গিয়ে, মাথায় কাপড় দিস্‌নে?

কমল। না।

বিমলা। আ—মরি!—মাথায় কাপড় দাও না যাড়! তবে কি ঠাকুর জামাইয়ের সঙ্গে গাড়ী চেপে, গাউন এঁটে, গড়ের মাঠে হওয়া খেয়ে বেড়াও না কি? ওলো জানি—জানি, বাপের বাড়ীতে সবাই অমন কথা বলে—আমরাও কত লোককে অমন কথা বলিছি।

কমল। তোর কথার ভাই, একটু পরে উত্তর দিচ্ছি। আচ্ছা বৌ দিদি! চক্রবর্ত্তীদের বৌটার অবস্থা কি শুনিছিস্‌?

বিমলা। তা আর শুনিনি? ওদের কথাত সবাই জানে। আজ স্নানের বেলায় তার সঙ্গে আমার দেখা হ'যেছিল। আহা! ওর ভাতার না কি আজ তিন বছর হ'তে নিরুদ্দেশ। কেউ বলে—জলে ডুবে মরেছে; কেউ বলে—বিবাগী হ'যে কোথায় চলে গিয়েছে। আহা! বৌটার কত রূপই ছিল, মনের দুঃখে যেন কালিপানা হ'য়ে গেছে। শুনিছি,—ওদের মাগ ভাতারে খুব ভাব সৌষ্ঠব ছিল, তবে এমনটা হ'ল কেন ভাই?

কমল। কি জানি ভাই! আমিও ত তাই ভাবি। আজ দুপুর বেলায় আমি ওদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম, শুনলেম, সে এতদিন তার বাপের বাড়ীতে ছিল, কাল বৈকালে এখানে এসেছে। আহা! বৌটা ভাতারের শোকে যেন, ক্ষেপার মত হ'য়েছে, দেখে বড় কষ্ট হ'ল। মাথায় তেল জল

নাই, চুলগুলো এলোমেলো হ'য়ে কতক পিঠের দিকে, কতক মুখের দিকে প'ড়েছে, গা' দিয়ে যেন খড়ি উড়ে যা'চ্ছে; পরণের কাপড়খানায় চিম্‌টালে ময়লা উঠে। আহা! এত যে ওর মনে কষ্ট, তবুও, আমাকে দেখে, হেসে হেসে কত জিজ্ঞাসাবাদ করলে! বৌটার কথাগুলি যেন মধু ঢালা। আহা! বৌদিদি, এমন লোকেরও এমন হয়!

বিমলা। ঠাকুরঝি! অদৃষ্ট অদৃষ্ট,—অদৃষ্ট ছাড়া আর পথ নাই। ভগবান্ ওর কপালে দুঃখ লিখেছিলেন, তা' নইলে এত কষ্ট ভোগ করবে কেন?

বিমলা সার্থক রমণী। হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা প্রভৃতির পঙ্কিল ছায়া, তাঁহার বিমল প্রকৃতিকে কখনও কলুষিত করিতে পারে নাই। পরের দুঃখে বিমলাসুন্দরীর প্রাণে বড় আঘাত লাগে। অদ্য কথায় কথায় লক্ষ্মীমণির দুর্ভাগ্যের কথা আলোচিত হওয়ায়, দারুণ মনোকষ্টে তাঁহার সুকোমল হৃদয়খানি বিগলিত হইয়া উঠিল। কমলমুখীও বিমলাসুন্দরীর অনুরূপ গুণরত্নে বিভূষিতা,—কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি কিছু চঞ্চল রকমের—সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ লইয়া, কালযাপন করিতে বড় ভালবাসেন। পতিবিরহিতা লক্ষ্মীমণির দুরবস্থার আন্দোলনে, তিনিও ব্যথিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই সুযোগে দুর্ম্মনায়মাণা ভ্রাতৃবধূকে লইয়া, কিঞ্চিৎ কৌতুক করিবার লোভও সংবরণ করিতে পারিলেন না। বিমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কি বৌদিদি! বলি, এত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়্‌ছিস্ কেন? দাদা বাড়ী এলেন ব'লে, কাজের গতিকে বোধ হয়, এবার বাড়ী আস্‌তে একটু দেরী হ'য়েছে, চাকুরে বাকুরে লোক, আপিসের নানা কাজের ভিড়ে সববার কি আর ঠিক সময়ে আসা ঘটিয়া উঠে?"

বিমলা। আ মরণ! তোর ভাই এক কেমন সৃষ্টিছাড়া রীত, সময় নাই—অসময় নাই কেবল ফষ্টি নষ্টি। আমি যেন তাই ভাবছি?

কমলা। কেন ভাই! আমি আর মন্দটা কি বলিছি।—পূজোর ২০।২৫ দিন থাকতে ত দাদা, প্রতিবারই বাড়ী আসেন, এই এবার ত আর পূজোর পনর দিন আছে, কিন্তু আজও বাড়ী এসে পৌঁছালেন না। এবার এমনটা কেন হ'ল—হাঁ বৌদিদি?

বিমলা। কেন হ'ল, তুই বল্‌তে পারিস্। তোর দাদা কি আমার ঘরে তাঁর বসিয়েছে, তাই কেন আসা হ'ল না? কিসের জন্য দেরী? তোর সব কথার জবাব দিব?

কমল। ভাই, একখানা পা'ল তোলা নৌকো কেমন হান্ হান্ ক'রে উজিয়ে আস্‌ছে দেখ।

বিমলা। ঠাক্‌রুণ বল্‌ছিলেন, এবার পূজোয় ঠাকুর-জামাই এখানে আসবেন। দেখ, বুঝি তোর ভাতারই বা ঐ নৌকায় এসে পড়ে।

কমল। তোর মুখে কি ছাই অন্য কথা নাই? ভাতার আর ভাতার,—ভাতারটাকেই তুই যেন সংসারের সার ভেবেছিস্, আজন্মটা কেবল ভাতার ভাতার ক'রেই মলি।

বিমলা। আর তুই বুঝি অসার ভেবে সসার হ'য়ে বসে আছিস্?—বলি, ভাতারের ভাবনা কে না ভাবে?—ভাতার, সংসারের সার একশো-বার। আমার ভাই পেট মুখ একখান; যখন যা, মনে আসে, ব'লে ফেলি,—আর তোরা অন্তঃসলিলার মত ভেতরে ভেতরে—বস্।

কমল। আচ্ছা বৌ-দিদি! মেয়েগুলা যেমন ভাতার ভাতার করে মরে, পুরুষগুলা ত কৈ তেমন ভাবে না?

বিমলা। কে বল্‌লে ভাবে না? ভাতারের মত ভাতার হ'লে অবশ্যই—

বিমলা সুন্দরীর কথায় বাধা দিয়া, কমলমুখী বলিলেন,—"বৌ-দিদি, ঐ দেখ, সেই নৌকোখান আমাদের ঘাটের কাছ দিয়ে যাচ্ছে; একটা মাঝি হা'লের গোড়ায় ব'সে, কি একটা গান গাচ্ছে, চুপ কর, আয় গানটা খানিক শুনে নিই।"

গঙ্গাগর্ভ প্রতিধ্বনিত করিয়া, মাঝি গাহিতেছিল,—

"কোথা পাণ পিয়সী, আমার হিদাকাশের পুণ্য শশী।
ও না দে'খে তোরে, দিন ছুপোরে, চৌদিকে হেরি নিশি॥
আমি রইনু এই পাথারে, তুই রইলি কোন্ স্থানান্তরে,
পাণ কেমন করে;—
পাণে সদাই জাগে, আগ বিরাগে, ও—সেই মুখখানি হাসি হাসি।
ছুগ্গা পুজো এগিয়ে এল, সভাই আপন গেহে গেল,
যে যেথায় ছ্যাল;—
ও ছাড় প্যাটের দায়ে, রইনু নায়ে, ছুখে রাঁখি যায় ভাসি।"

দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি, দূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া গেল। সুতরাং সঙ্গীতধ্বনিও ক্রমশঃ অস্পষ্ট শ্রুত হইয়া, পরিশেষে আর কর্ণে আসিয়া

পঁহুছিল না। বিমলা সুন্দরী ও কমলমুখী, এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে গান শুনিতেছিলেন, সঙ্গীত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে হর্ষ ও প্রফুল্লতার চিহ্ন, উভয়ের বদনমণ্ডলে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইতেছিল; সঙ্গীতস্রোত নিরুদ্ধ হইবামাত্র, তাঁহাদের হাস্যের প্রবাহ, এক্ষণে প্রবলবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। হাসিয়া হাসিয়া কে কার গায়ে পড়ে! বিমলা সুন্দরী এইবার সুযোগ পাইয়া বলিলেন,—"ঠাকুরঝি! কেমন, তুই না ব'লছিলি,—'পুরুষগুলা ত কৈ তেমন ভাবে না?—এখন শুন্‌লি ত?—আমিও তাই ব'লছিলাম, ভাতারের মত ভাতার হ'লে অবশ্যই ভাবে,—প্রকৃত ভালবাসা থাক্‌লে, কখনই না ভেবে থাক্‌তে পার্‌বে না।"

বেলা অবসান হইয়া আসিল,—যুবতীদ্বয় অগত্যা কথোপকথন বন্ধ করিয়া, গৃহগমনে বাধ্য হইলেন। দিনমণি, স্বকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপনান্তে, পশ্চিম গগনতলস্থ অন্তিম শয্যায় ঢলিয়া পড়িলেন। পতিবিরহবিধুরা বসুন্ধরা দুর্ব্বিষহ স্বামীশোকে মুহ্যমানা হইয়া, তিমিরাবগুণ্ঠন সমার্পণ পূর্ব্বক বৈধব্যোচিত বিমলিন বেশ পরিগ্রহ করিলেন। বিহঙ্গমগণ, কলধ্বনিচ্ছলে ধরণীর এই দারুণ দুরবস্থার কথা, বিজ্ঞাপন করিতে করিতে দ্রুতগতি স্ব স্ব কুলায়াভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল। সান্ধ্যপবনের মৃদুল প্রবাহে, পাদপরাজি মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতে থাকায়, বোধ হইল যেন তাহারা ধরিত্রীর শোকাশ্রু মুছাইবার জন্য সমুৎসুকচিত্তে করপল্লব বিস্তার করিতেছে। দেখিতে দেখিতে গাঢ় অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়।

গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

যে সকল উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট পদার্থ গুণক্ষোভের পর সমুদ্ভব-হইয়াছে, তাহাদের মঙ্গল হইতে পারে না, সর্ব্বনাশক কালই তাহাদের মঙ্গল কবলিত করে। এইজন্য আর্য্য-মুনি-ঋষিগণ উপাসনার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নি বালুকা
বিবর্জ্জিতে শব্দ জলাশ্রয়া দিভিঃ
মনোহ্নকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥"

অর্থাৎ সে সকল সমতল পবিত্র ভূমি কঠোর কঙ্কার প্রস্তরাদি ও উত্তপ্ত বালুকা রহিত, যে স্থানে সুখ শীতল বারির মনোহর দৃশ্য চক্ষের প্রীতি উৎপাদন করে এবং বিহঙ্গমকুলের সুমধুর কণ্ঠরবে হৃদয় আনন্দিত হয় এবং যে স্থানে বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা আসিয়া বিরক্ত করিতে না পারে, তাদৃশ স্থানে উপাসনা করিতে হয়।

ভগবান, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া, এই বিশ্বের সকল প্রাণীর অন্তরেই জীবত্মার একমাত্র নিয়ন্তারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি সত্যস্বরূপ ও বিশুদ্ধ ও নিত্য মুক্ত ব্যক্তির এই দৃশ্যমান জগতে কার্য্য কারণভাবে মায়ারূপেই বিভাসিত হইতেছেন। তাঁহারি কৃপায় বিবেক-বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইলে ঐ মায়া তিরোহিত হয়। তাঁহার কৃপায় এই সংসার সমুদ্র মধ্যস্থিত হাঙ্গর কুম্ভীরাদিরূপ ষড়িন্দ্রিয় হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং তাঁহার চরণকমল আশ্রয় করিয়া, দুস্তর সংসার ব্যসন হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

আর্য্যমুনিঋষিগণ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু কয়জন লোক সেই নিয়ম প্রতিপালন করেন। গৃহীব্যক্তি আবশ্যক মত বিষয়সুখ অনুভব করিবে, কিন্তু তাহাতে অনাসক্ত হইবে; যে পরিমাণে আহার করিলে প্রাণরক্ষা হয়, তদধিক আহার গ্রহণ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দরিদ্র ব্যক্তির ধনোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে। অসন্তুষ্টই ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ। যাহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট নহে,—তাহাদের সমস্ত কার্য্যই ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় বিফল। লোভের অন্ত জানিতে কেহ কখনও সমর্থ হন নাই। মনুষ্য ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া বাসনার সীমা এবং অসূয়া ও ক্রোধের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হইয়াও কখনও লোভের সীমা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং অসন্তোষই মানবের অধঃপতনের মূলকারণ। এই হেতু কামনা সর্ব্বপ্রথমে ত্যাজ্য। এবং কামনা না থাকিলে ক্রোধ হইতে পারে না। ছয় ইন্দ্রিয়াদি দমনকরতঃ কাম লোভ হইতে চিত্ত অনাসক্ত

হইলে আর কখন পদস্খলন হইবার সম্ভবনা নাই; কারণ কামাদিদ্বারা যাহার চিত্ত বিকৃত না হয়, তাহার চিত্ত অন্য কিছুতেই বিকৃত হইতে পারে না।

এই সংসারে মধুকর ও অজগর এই দুইটী আমাদের শিক্ষার ও উপমার স্থল। ইহাদের নিকট হইতে আমরা বৈরাগ্য ও সর্ব্ব অবস্থায় সন্তোষ থাকা শিক্ষা করিতে পারি। মধুকর যেমন অহর্নিশ পরিশ্রম করিয়া মধু আহরণ করিয়া অতিকষ্টে সঞ্চয় করিলে মনুষ্য তাহাদিগকে তাহাদের সেই কষ্ট-সঞ্চিত মধু হইতে বঞ্চিত করে, তদ্রূপ ধনী ব্যক্তিদিগকে বধ করিয়া অপরে তাহার ধন অপহরণ করে। পুত্র পিতাকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে বধ করিয়া যে রাজ্য গ্রহণ করে, তাহা ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে সাক্ষী দিতেছে। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহার দ্বারাই শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং কামনা ত্যাগ করেন। আর অজগর একস্থানে বহুদিবস শয়ন করিয়া থাকে, আহারীয় দ্রব্য অন্বেষণের বা অন্য কোন কারণে স্থান ত্যাগ করে না, যাহা সে সেই স্থান হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহাই ভক্ষণ করে। দুই চারি দিবস কিছু না পাইলেও অস্থির হয় না, সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে। আমরা ইহা হইতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে ও প্রাপ্তবস্তু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই সকল উপদেশ রক্ষা করিতে যত্নবান হইবার পরিবর্ত্তে আমরা দিন দিন নরকের অন্ধতম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছি। স্ত্রী পুত্রগণের উদর পূরণের জন্য আমরা গর্দ্দভের ন্যায় অনবরত সংসারভার বহন করিতে দুঃখিতান্তঃকরণে দেহাদির সহিত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। উদ্ঘাটিত মুক্তিদ্বারস্বরূপ নবদেহ প্রাপ্ত হইয়া বিহায়সের ন্যায় * গৃহাসক্ত হইয়া আরূঢ়চ্যুত হইতেছি। পণ্ডিতেরা যে মৃত্যুরূপিণী-স্ত্রীকে কদাচ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আমরা সেই নরকের দ্বাররূপিণী স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া বাত্যাতাড়িত তৃণের ন্যায় ঐশ্বরী-মায়াতে মুগ্ধ হইয়া সংসারার্ণবে হাবুডুবু খাইতেছি; স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া নিরন্তর সুখের চেষ্টা করিতেছি। বলি, নিত্য সুখদায়ক, দুর্লভ ধনাদি, পুত্র, বন্ধু প্রভৃতি লাভ করিলে কি আনন্দ হয়? এই অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলিয়া জ্ঞান, দুঃখময় পদার্থকে সুখপ্রদায়িনী বলিয়া আলিঙ্গন করাতে পুরুষ ধ্বংশের পথে অধিকতর দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইতেছে।

* শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ খণ্ড, অবধূত উপাখ্যান দেখুন।

সংসারতাপে তাপিত তনু শান্ত করিবার উপযুক্ত পদার্থ চন্দনে মর্দ্দন করিয়া বিষ্ঠা তুল্য নক্কারজনক দ্রব্য অন্বেষণ করিতেছে।

গৃহী এবং গৃহস্থের ধর্ম্ম—ব্রহ্মচর্য্য, শৌচ, তপস্যা, সন্তোষ, সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা এবং রাক্ষস এবং ভূতদিগের নিধন করা। খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত হইলে ভালমন্দ বিচার না করিয়া গ্রহণ করা এবং পরিধেয় বস্ত্র তদ্রূপ পাইলেই পরিধান করা এবং শয্যাও যেরূপ পাইবে, তাহাতে শয়ন করিবে। আমরা কি এই সকল অনুজ্ঞা পালন করি, না প্রতিপালন করিতে ভ্রমেও কোন দিন চেষ্টা করি। ব্রহ্মচর্য্য ত একবারেই উঠিয়া গিয়াছে; শৌচ আছে,—মলত্যাগ করিয়া হস্তপ্রক্ষালনও অনেকে করেন কি না সন্দেহ। তপস্যা,—এখন শ্বেতাঙ্গপুরুষের মনস্তুষ্টি করাই তপস্যা হইয়া উঠিয়াছে। সন্তোষ,—এখন সর্ব্বাবস্থাতেই সন্তোষ থাকিতে হইতেছে। বড়সাহেবের পদাঘাত ও গৃহিণীর শতমুখী প্রহার এখন উভয়ই মধুর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। রাক্ষস ও ভূতদিগের নিধন—এটা পূর্ণমাত্রায় সাধিত হইতেছে। আজকাল পুত্রের নিকট পিতা রাক্ষস, ছাত্রের নিকট পণ্ডিত, নব্যলেখকের নিকট সমালোচক প্রভৃতি রাক্ষস ও ভূত বলিয়া জ্ঞান হয় এবং তাহাদিগকে নিহত করিতে পারিলেই শাস্ত্রপালন হইল। সর্ব্বভূতে সমদর্শীতার পরিবর্ত্তে স্ত্রীজাতির প্রতি সমদর্শীতা কতকটা দেখান হয় বটে। কিন্তু এই স্ত্রী লইয়াই সংসার,—ইহাই আমাদিগকে ত্যাগ করা উচিত, স্ত্রী এবং স্ত্রী-সঙ্গী-পুরুষের সংসর্গে যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কাহারো সংসর্গে সেরূপ হয় না। আদিদেব ব্রহ্মা নিজ দুহিতার রূপ-মাধুরিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত নিলর্জ্জের ন্যায় মৃগশরীর ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। এই ব্রহ্মার সৃষ্ট মরীচ্যাদি, তাঁহাদের সৃষ্ট কশ্যপাদি এবং তাঁহাদের সৃষ্ট এই মনুষ্যাদি জীবগণ। যখন জীবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং প্রমদারূপিণী মায়া দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সৃষ্টবস্তুর কথা আর কি বলিব? বড় বড় বীর পুঙ্গব, যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী দশসহস্র প্রাণী বধ করিতেও কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করেন না, তাঁহারাও কামিনীর কমনীয় ভ্রূ ভঙ্গিতেই আকৃষ্ট হইয়া পদানত হন। অতএব যিনি নিজের ইষ্টচিন্তা করেন, তিনি কখনই স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। ষোলকলায় পরিপূর্ণ কামিনীমায়া শুশ্রূষাদি দ্বারা ক্রমে ক্রমে অনুগত হয়। কিন্তু মুমূর্ষ ব্যক্তি তৃণাচ্ছন্ন গভীর কূপের ন্যায় তাহাকে নিজের মৃত্যু স্বরূপ

জ্ঞান করিবেন। পুরুষ স্ত্রীসংসর্গে বাস করিতে করিতে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষবৎ আচরণকারিণী ঐশ্বরীমায়াতে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রী, পুত্র স্বামীরূপে জ্ঞান করে। কিন্তু বুদ্ধিমতী ভামিনী এই পতিকে ব্যাধের ন্যায় আপনার যম বলিয়া জানিবে।

এইজন্য সংসারে থাকিয়া উপাসনা হয় না, এইজন্য যাঁহারা চিত্ত জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন,—সংসারে মায়া-রজ্জু ছিন্ন করিয়া একাকী নির্জ্জনে অবস্থান করিবেন। স্ত্রী অগ্নিস্বরূপ এবং পুরুষ ঘৃত স্বরূপ। ইহারা দুইজনে কথনো একত্র হইবে না। পুরাকালে পুরঞ্জন নামে যশস্বী নৃপতি ছিলেন। তিনি ধন, পুত্র, স্ত্রীতে বিরক্ত হইয়া স্বীয় আবাসগৃহ অন্বেষণ করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করেন, কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার মনোমত হইল না। অনন্তর পুরঞ্জন একদা হিমালয়ের দক্ষিণ সানুতে নবদ্বার বিশিষ্ট এক সুন্দর ভবন দেখিতে পাইলেন। তিনি তদভিমুখে অগ্রসর হইলে এক অনিন্দ্য সুন্দরী কামিনীরত্ন তাঁহার নয়নপথের পথিক হইল। কামিনীর তিলফুলের ন্যায় নাসা, পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখকমল, কচি কচি দুইটী ঠোঁট, বর্ণ শ্যামল, পিঙ্গলবর্ণের মনোহর বস্ত্রে কটিদেশ আচ্ছাদিত, তথা স্বর্ণমেখলা পরিবেষ্টিত সুপ্রশস্ত নিতম্বদেশ, পীনোন্নত পয়োধরযুগল এরূপভাবে বর্দ্ধিত যে, তাহাদের মধ্যভাগে তিলার্দ্ধও অবকাশ নাই! কামিনী লজ্জাবশতঃ অঞ্চল দ্বারা স্তনদ্বয় আবৃত করিতে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইতেছে। প্রেমভরে মৃদুমন্দ হাস্যের সহিত ভ্রাম্যমান ভ্রূস্বরূপ শরাসন হইতে মনোহর অপাঙ্গরূপ পুঙ্খশোভিত বিলোল কটাক্ষবাণ বর্ষণ করিতেছে, রাজা পুরঞ্জন তদ্দ্বারা বিদ্ধ হইলেন। রাজা সেই কামিনীর সহিত তথায় বিহার করিতে লাগিলেন।

নবদ্বার বিশিষ্ট যে পুরীর কথা লিখিত হইয়াছে, সেই পুরীর উপরিভাগে সাতটী এবং নিম্নভাগে দুইটী দ্বার আছে। যিনি ঐ পুরীর অধীশ্বর হইবেন, তিনি ঐ দ্বার দ্বারা বহির্গত হইয়া ইচ্ছামত সুখ অনুভব করিবেন। রাজা স্ত্রীর প্রতি এতই আসক্ত হইলেন যে, মহিষী যে কার্য্য করেন, তিনি তাহারই অনুকরণ করেন। এইরূপে তিনি কাষ্ঠের পুত্তলির ন্যায় স্ত্রী কর্ত্তৃক চালিত হইতে লাগিলেন। তাহার পর কামিনীর সহিত বিহার করিতে করিতে কামাত্মা পুরঞ্জনের নবযৌবন অতিবাহিত হইল। তাঁহার একাদশ শত পুত্র হইয়াছিল। এই পুরঞ্জনের বংশধরগণ কর্ত্তৃক পাঞ্চালরাজ্য পরিবর্দ্ধিত

হইয়াছে। অনন্তর কাল উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার সেই প্রিয় জায়াস্নুতকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি মৃত্যুসময়ে পত্নীর দশা কি হইবে চিন্তা করিতে করিতে তনুত্যাগ করিলেন। স্ত্রীসম্ভোগ জন্য রাজার ব্রহ্মজ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। তিনি সেই অবস্থায় শতবৎসর অশেষ বিশেষ যাতনা ভোগ করেন। তিনি মৃত্যুসময়ে স্ত্রীর কথা ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করেন বলিয়া, পরজন্মে বিদর্ভরাজের গৃহে স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ড্যদেশীয় রাজা মলয়ধ্বজ তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে এক কন্যা এবং সাতপুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

যে কামিনীর দর্শনে রাজার ব্রহ্মজ্ঞান বিনষ্ট হইল, যাহার সংসর্গ করার জন্য তিনি শতবৎসর কষ্ট পাইলেন, যাহার চিন্তা করার জন্য স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন, সেই মৃত্যুরূপিণী স্ত্রীর সংসর্গ করা উচিত কি না, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই বিবেচনা সাপেক্ষ। গৃহে থাকিয়া এবং স্ত্রীসংসর্গে অবস্থান করিয়া এক আধ জনকে নির্ব্বিকার দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য শিষ্য রামানন্দ দুইজন পরমাসুন্দরীর সংসর্গে অবস্থান করিয়াও নির্ব্বিকার ছিলেন।

দুই দেবকন্যা হয় পরমাসুন্দরী,
নৃত্য গীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী।
তাহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃতে উদ্যানে;
নিজ নাটকের গীতে শিখায় নর্ত্তনে।
* * * * * *
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ (তৈল) মর্দ্দন;
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সম্মার্জ্জন।
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন;
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব,
তরুণী স্পর্শে রায়ের তৈছে স্বভাব।
সেব্য বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন,
স্বাভাবিক দাস্য ভাব করি আরোপণ।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা;
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি প্রেম সীমা।

তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল,
গীতের নিগূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল।
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন,
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তাঁর মন।

কয়জন লোক রামানন্দের মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? কয়জন কামিনী সংসর্গে নির্ব্বিকার চিত্তে থাকিতে পারেন। রামানন্দের যেমন,—

এক দেব দাসী আর সুন্দরী তরুণী,
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি।
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ,
* * হয় তাঁর দর্শন স্পর্শন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন,
নানা ভাবোদ্গম তারে করিয়া শিক্ষণ।
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম,
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন।
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার,
তাতে জানি অপ্রকৃত দেহ তাঁহার।
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র
তাহা জানিবার আব দ্বিতীয় নাহি পাত্র।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "নবযৌবনসম্পন্ন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী রূপের রাণী স্ত্রী স্পর্শেও রামানন্দের চিত্ত কলুষিত হয় নাই। রামানন্দের চিত্তে কখনো কামাদি লক্ষিত হয় না এবং তাঁহার মনের ভাব তিনিই কেবল জানেন, জানিবার দ্বিতীয় পাত্র কেহ নাই।"

ছোট হরিদাস স্ত্রীলোকের নিকট হইতে তণ্ডুল চাহিয়া আনিয়া, প্রভুর ভোগ দিয়াছিলেন। এই অপরাধে—স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলিবার অপরাধে মহাপ্রভু তাঁহার আর মুখ দর্শন করেন নাই। তিনি নিজ ভৃত্যশিষ্যকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন,—

আজি হৈতে মোর আজ্ঞা পালিবা,
ছোট হরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা।
* * * * *

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ,
দারু প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন।

যে বৈরাগী প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ করে, আমি তাহার মুখ দেখি না। দারু প্রকৃতি অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রী-প্রতিমাও মুনিগণের মন হরণ করিতে পারে। এখন কথা হইতেছে, মনই সংশয়ের কারণ। এই মন জয় করিতে না পারিলে, সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। স্ত্রী-সংসর্গ করিলে মনকে জয় করা যায় না। সুতরাং মন জয় করিতে হইলে স্ত্রী-সংসর্গ পরিহার করিতে হইবে। স্ত্রী-সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারিলে আর তোমাকে কিছুতেই বাঁধিতে পারিবে না। তখন তোমার নিকট গৃহ ও শ্মশান একই জ্ঞান হইবে। তখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থে আর তোমাকে অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হইবে না। পূর্ব্বে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও যে তুমি ক্লিষ্ট হইতে, এখন কঙ্কর—কঠিন ভূমিও তোমার নিকট কার্পাস হইতেও কোমল বলিয়া জ্ঞান হইবে। কোমল উপাধানের পরিবর্ত্তে নিজ বাহুদ্বয় মস্তকে রাখিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবে। অঞ্জলি আছে বলিয়া ভোজনপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিবে। এবং দিক্ ও বৃক্ষত্বক্ অনায়াসলভ্য বলিয়া আর পট্টবস্ত্রের অনুসন্ধান করিবে না।

যদি খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান বিনা প্রার্থনায় পাওয়া যায়, তবে ধন-দুর্ম্মদান্ধ মনুষ্যদিগের পাদসম্বাহে প্রয়োজন কি? পথে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষ সকল কি ফলদান করে না? তাহারা কি ভিক্ষা দেয় না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? আশ্রয় পাওয়া যায় না কি? তুমি যদি এ সকল কিছু না পাও, তাহা হইলে কি দীননাথ দীনবন্ধু দীন বলিয়া তোমায় আশ্রয় দিবেন না?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া, বিষয়ে বিরক্ত হইয়া, নিজ নিজ চিত্তে স্বতঃ-সিদ্ধ আত্মার সেবা করা উচিত। এক আত্মাই সত্য, অপর সমস্ত পদার্থই মিথ্যা এবং উপাস্যের যত প্রকার গুণ থাকা উচিত, তৎসমুদায় তাহাতেই আছে এবং নিত্য এই প্রকার মনে কল্পনা করিয়া, সেই পরম পুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন হইলে, সংসারের কারণ—মায়ার উপরতি হয়। বিষয়-চিন্তায়

নিমগ্ন হইলে, সংস্থিতি রূপ ভয়ানক বৈতরণীতে (যমের দ্বারের নদী) পতিত হইয়া, নিজ কর্ম্মানুযায়ী আধ্যাত্মিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ইহা জানিয়া শুনিয়াও অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হওয়া নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। পরিত্রাণের জন্য সকলেরই ভব-সাগরের কাণ্ডারী সেই হরির চিন্তা করা উচিত।

শ্রীব্রজসুন্দর ভক্তিবিনোদ।

চূড়ামণি যোগ।

সূর্য্যগ্রহঃ সূর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহোভবেৎ।
চূড়ামণিরয়ং যোগ স্তত্রানন্তফলং স্মৃতং॥

বিগত ১৫ই চৈত্র রবিবারে সূর্য্য গ্রহণোপলক্ষে এই চূড়ামণি যোগ সংঘটিত হইয়াছিল। গঙ্গা স্নানার্থে অসংখ্য যাত্রী নানাস্থানে গিয়াছিলেন। আমরা বারুণী যোগের পূর্ব্বেই বোয়ালিয়া হইতে ১০ই চৈত্র নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া, পরদিন মধ্যাহ্নে মরিচায় পঁহুছিলাম। পাতিবোনা ও মরিচার গাড়োয়ানগণের মধ্যে অনেকে যোগের সময় নিরীহ যাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার উপদ্রব করে। কেহ অর্দ্ধপথে আরোহীকে অবতরণ করিতে বাধ্য করিয়া, অতিরিক্ত ভাড়ার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়া লয়। অস্বীকার করিবার উপায়াভাব, গাড়োয়ানগণ একদলবদ্ধ। উহাদের প্রস্তাবে অসম্মত হইলে অন্য আরোহী লইয়া প্রস্থানপর হয়। তাহা জানিয়াই, আমরা গমনের পূর্ব্বদিনে মরিচা কুঠিয়ের সুযোগ্য দেওয়ান শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে গো ও মহীষ শকট সংগ্রহ প্রার্থনায় পত্র লিখি, তিনি কৃপা করিয়া সাতখানি শকট সংগ্রহ রাখিবার আদেশ দিয়াছিলেন। আমরা ষ্টিমার ঘাটে স্নানাহার অন্তে কেহ পদব্রজে, কেহ কেহ গো মহীষ শকটে যাত্রা করিয়া, রজনীতে বালিচরে উপনীত হইলাম, এবং পতিতপাবনী সুরধুনী দেবীকে দর্শন ও প্রণামান্তে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বাসায় অবস্থান করিয়া নিশি প্রভাতে ১২ই তারিখ বারুণীযোগে স্নানাদিতে অতিবাহিত হইল। নিশিশেষে আমরা নলহাটীতে দেবীপীঠ দর্শনে যাত্রা করিলাম।

নলহাটী।

পুরাণপ্রসিদ্ধ নলহাটী গ্রামে সতীর ত্যক্ত তনুর নালাপাত হয়, তাই স্থানটী নলহাটী বলিয়া খ্যাত। দেবী পীঠের নাম কালিকা, ভৈরব যোগেশ নামে প্রসিদ্ধ। আজিমগঞ্জে রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া নলহাটী যাইতে প্রত্যেকের পৌণেছয় আনা মাসুল দিতে হয়। আমরা ১৩ই চৈত্র প্রত্যূষে নলহাটী ষ্টেশনে পহুছিলাম, ষ্টেসন হইতে মায়ের মন্দির অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে। সকলেই পদব্রজে যাত্রা করিয়া প্রথম যামার্দ্ধে পুরদ্বার প্রান্তে উপনীত হইলাম। পুরাতন পুষ্করিণীতীরে স্নানান্তে সকলে জগজ্জননীকে দর্শন ও পূজা ভোগ প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ক্ষুদ্র পর্ব্বতপ্রান্তে চতুর্দ্দিক প্রাকার পরিবেষ্টিত মায়ের মন্দির ও ভোগাগার। পুরমধ্যেই পুষ্পোদ্যান। দেবীমন্দির সম্মুখে ধর্ম্মপ্রাণ মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুরের রাজ-কর্ম্মচারী-পূর্ণ দ্বিতল রাজকাছারী। পুর তোরণ প্রান্তে যোগেশ ভৈরবের ক্ষুদ্রায়তন মন্দির, তন্মধ্যে অনাদি লিঙ্গরূপী যোগেশ ভৈরব বিরাজমান। দেবীর পুরীর পশ্চাদ্ভাগে অদূরে গিরিগাত্রে মুসলমান সম্রাটের হিন্দু দেব-দেবী-বিদ্বেষ-ব্যঞ্জক সমাধি সৌধ হিন্দু-দর্শকচিত্তে ক্ষোভ উৎপাদন করিতেছে। মন্দির মধ্যে অব্যক্তরূপা দেবী বিরাজ করিতেছেন। পাষাণ অঙ্কিত সুন্দর মুখপদ্ম মাত্র দর্শনীয় ও দর্শকের নয়ন মন কৃতার্থকর। দর্শকদিগের প্রতি পাণ্ডা প্রভৃতির কোন-রূপ পীড়ন বা রাজকর নাই। পুরোহিত পাণ্ডাগণ স্বল্পলাভে সন্তুষ্ট। রাজ-দত্ত মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্ত দ্বারা রাজামাত্যগণের সুতত্ত্বে দেবীর প্রাত্যহিক পূজা ভোগাদি যথারীতি যথাকালে সুশৃঙ্খলায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাত্রীগণের প্রতি পুরোহিত পাণ্ডাগণ অন্যায় অতিরিক্ত কিছু না লইতে পারে, তদ্বিষয় রাজামাত্যগণের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। আমাদের সঙ্গে শুদ্ধাচারবতী সধবা বিধবা অনেক ব্রাহ্মণ পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যাহ্নিক আহারার্থ স্থানদান ও আয়োজন অনুষ্ঠানে এবং দেবীর পূজা ভোগাদির দ্রব্যাদি সংগ্রহে রাজামাত্যগণ যথেষ্ট সহায়তা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন ও স্মরণীয় হইয়াছেন। আমরা মাননীয় রাজা বাহাদুর ও তাঁহার উপযুক্ত অমাত্যগণকে সানন্দে শত শত সাধুবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া অপরাহ্নে মায়ের নিকট বিদায়কালে মনে মনে একটী সঙ্গীত আলোচনা করিয়াছিলাম।

উপসংহারে মাননীয় রাজসমীপে বিনীত প্রার্থনা এই, মায়ের মন্দিরের অদূরে একটীমাত্র অতি পুরাতন ও অল্পতোয়া পুষ্করিণী আছে, তত্তীরেই মায়ের পূজা ও ভোগাদি নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। দেবসেবার্থ সদ্ব্যয়ে মুক্ত-হস্ত বলিয়া বিখ্যাত সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় রাজা বাহাদুর দেবীর পূজা ও পানার্থ-জলের জন্য একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়া দেবী দর্শনার্থ যাত্রীদিগের বিশেষতঃ জগদম্বার স্নান, পূজা ও পানার্থ-জলের সুবিধা করিয়া দিয়া, তিনি অধিকতর যশ, পুণ্য ও কীর্ত্তিসঞ্চয় করুন। আমরা কায়মনে মায়ের নিকট তাঁহার মঙ্গল ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

[ক্রমশঃ]

শ্রীরামজয় কবিরত্ন।

ব্রজসুন্দর।

আজ যাহার কথা আমরা লিখিতেছি, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষতঃ আলোচনার পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। সুতরাং আমরা তাঁহার প্রশংসা করিলে আত্মহত্যার তুল্যই হইবে বিবেচনায়, কেবল তাঁহার বংশ-পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল বঙ্গাব্দ ১২৮৬ সালের ৯ই বৈশাখ সোমবার রজনী দেড় প্রহরের সময় রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বেঙ্গাড়ী গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত বরদাগোবিন্দ সান্ন্যাল। ইনি একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী স্বনামধন্য পুরুষ। ইনি দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রসিদ্ধ নীলকর রবার্ট ওয়াটসন্ এণ্ড কোম্পানীর রাজসাহী-জেলার রাজপুর কান্সরিনের সদর কাছারীতে শিক্ষানবিশরূপে প্রবেশ করেন, পরে স্বীয় অনন্য অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতার প্রভাবে তিনি ক্রমশঃ প্রধান কর্ম্মচারীর পদপ্রাপ্ত হন। ৩২ বৎসরকাল নিজের দায়ীত্বপূর্ণ কর্ম্ম বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করিয়া, আজ ১৪ বৎসর হইল, তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তিনি দিবসের অধিকাংশ ভাগ ধর্ম্মালোচনায় অতি-বাহিত করেন ও মধ্যে মধ্যে তীর্থ দর্শন করিতে বাহির হন। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি অতি অল্প ছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় এখন তিনি রাজ-সাহীর মধ্যে একজন গণ্যমান্য বর্দ্ধিষ্ণু ভূম্যাধিকারী।

ব্রজসুন্দরের পাঁচ ভাই। জ্যেষ্ঠ গোবিন্দসুন্দর রাজসাহীতে মোক্তারি করেন, দ্বিতীয় রাধাসুন্দর (ইনি ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দ্বাদশ বর্ষীয়া এক বালপত্নী রাখিয়া, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে অকুল শোকসাগরে মগ্ন করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন) তৃতীয় গোপেন্দ্রসুন্দর, চতুর্থ ব্রজসুন্দর। ব্রজ যমজ সন্তান, অন্যটীর নামকরণ হইবার পূর্ব্বেই কালকবলে পতিত হয়।

১৮৯৮ খ্রীঃ অঃ ব্রজসুন্দর রাজসাহী কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এই সময়েই তিনি দুরারোগ্য পৈত্রিক হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হন। এই হাঁপানিই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির অন্তরায় হইল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি শয্যাশায়ী হইলেন, কলেজে যাওয়া বন্ধ হইল, অবশেষে ডাক্তারদিগের পরামর্শানুসারে তিনি কলিকাতায় চিকিৎসা করিতে আসিলেন ও রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া তাঁহার রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে কলিকাতার প্রসিদ্ধ দুইজন চিকিৎসকের অভিমতে তিনি সেকেণ্ডইয়ার ক্লাশে পড়িবার সময় কলেজের পাঠ ত্যাগ করিয়া বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে দেওঘরে গমন করেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া একটু সুস্থ হইলে রাজসাহীতে ফিরিয়া আসেন।

ব্রজসুন্দরের শৈশব হইতেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ আছে। পাঠ্যাবস্থা হইতেই তিনি লিখিতেন। কতকগুলি সেই সময় রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র হিন্দুরঞ্জিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

দেওঘর হইতে আসিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে হিন্দুরঞ্জিকায় গদ্য প্রবন্ধ লিখিতেন ও ইংরাজি-দৈনিক Statesman Power and Guardian এবং সাপ্তাহিক Standard নামক পত্রত্রয়ের রাজসাহীর করস্পন্ডেন্ট হন। এই সকল কাগজে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে। এই সময় হিন্দুরঞ্জিকার সম্পাদক পদ শূন্য হয়। ব্রজসুন্দর আবেদন করিলে তাঁহারই প্রার্থনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। তিনি অতি দক্ষতার সহিত হিন্দুরঞ্জিকার পরিচালন করিতে লাগিলেন কিন্তু সাত মাসের অধিক আর এ কাজ করিতে পারিলেন না। নিষ্ঠুর হাঁপানিই ইহার একমাত্র কারণ। অত্যধিক পরিশ্রমে রোগ বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি পুনরায় বায়ু পরিবর্ত্তনে বাহির হন এবং পশ্চিমের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ইহাঁরা রাজসাহীর মধ্যে অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আত্মাংশেও কম নহেন,

পুখুরের সান্যাল। ব্রজসুন্দরের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি সমধিক অনুরাগ, এখন তিনি অধিকাংশ সময় বৈষ্ণব শাস্ত্রালোচনায় ব্যয়িত করিতেছেন।

শেষবার পশ্চিম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর, ব্রজসুন্দর সান্যাল মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রদীপ, নির্ম্মাল্য, সুধা, নব-প্রতিভা, ছায়া, বীরভূমি, আলোচনা, অনুসন্ধান, আরতি, অতিথি প্রভৃতি কাগজে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে ও হইতেছে। রাজসাহীর সুপরিচিত 'উৎসাহ' পত্রের সম্পাদন ভার দুই বৎসর হইল তাঁহারই সুযোগ্য হস্তে ন্যস্ত আছে।

'অনুসন্ধান' পত্রে ব্রজসুন্দর, শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় প্রণীত Poverty Problem in India নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন ও কয়েক মাস হইল, একখানি ছোট গল্পের পুস্তক ছাপাইয়াছেন। তিনি 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামক একখানি প্রাচীন অপ্রকাশিত বৈষ্ণবগ্রন্থ পুস্তকাকারে খণ্ডে খণ্ডে বাহির করিতেছেন। অদ্বৈতমঙ্গলের টীকা টীপ্পনি দেখিয়া সাহিত্য-রথী রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ, পণ্ডিতাগ্রণ্য শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

ইংরেজী ও বাঙ্গালার সহিত ব্রজসুন্দর হিন্দি ভাষা কিছু শিক্ষা করিয়াছেন। কবীরের দোঁহাবলী ও চাঁদকবির বীর গাথার অনুবাদই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সর্ব্বদা নানা রোগে ভুগিয়াও পাঠের প্রতি অনুরাগ তাঁহার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

পরিশেষে আমরা ভগবানের নিকট ব্রজসুন্দরের সুস্থশরীর ও দীর্ঘ-জীবন কামনা করি এবং ব্রজসুন্দরকে অনুরোধ করি, তিনি যেন এইরূপ বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় নিরত থাকেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

টেপু!

মে-উ-মা ব'লে মুখের পানে তাকুচো কেন চেয়ে ;
আয় কোলে আয় জুড়াই জ্বালা তোকে বুকে নিয়ে।
পাষাণ-হৃদয় প্রাণের সখা ছেড়ে গেলে পরে,
পেয়েছি তোরে বুকের মাঝে, তাই রেখেছি ধ'রে।
খুন্ খুনাখুন্ সোণার মাণিক, মে-উ-মা ব'লে ডাক ;
প্রাণের মাঝে কত আগুন তুই ত জানিস্ না'ক,
প'ড়্লে মনে মনের কথা, অবশ হ'য়ে পড়ি,
থর্ থরিয়ে হাত-পা কাঁপে, দৃষ্টি রোধে বারি।
বল্ না টেপু ; ও চাঁদমুখে তোর দুঃখিনী মাকে,—
সে কেন তায় পায়ে ঠেলে, যে পরাণ দেয় যাকে ?

শ্রীমতী নারায়ণী।

নিঠুরে।

(এত) চরণে ধরিয়ে মিনতি করিনু,
কেমন নিঠুর হায় ;
(ওগো!) ফিরে না চাহিল,—তবু কাঁদে প্রাণ,
ভুলিতে নারিনু তাঁয়।
কি ছল পাইল, মোরে তেয়াগিল,
হৃদয়ে অনল জেলে ;
আমি যে পিয়াসী, পরাণ উদাসী ;
দেখিল না সে তা ভুলে !
এমন নিঠুরে পরাণ সঁপিনু,
জানাইব দুঃখ কারে,
শঠতা করিয়ে, মজাইয়ে মোরে,
কি সুখ সে পাইল রে!

আলোচনা।

না জানি কেমনে, পাষাণ-হৃদয়,
এত দুঃখ মোরে দিল,
মুখেতে জানাও, কত ভালবাসা,
বহুরূপী সাজে ছিল।
কত দিন আ'জ, দেখি নাই তারে,
বুঝি দেখা দিবে না সে,
ভুলি নাই আমি, সে কেন ভুলিল,
দুঃখ রহিল মানসে।

শ্রীমতী নারায়ণী।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা।

বঙ্গভাষা।—মাসিক পত্র, বৈশাখ মাসের প্রথম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সংখ্যা পাঠে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে ভবিষ্যতে পত্রিকাখানির বিশেষ উন্নতির আশা আছে বোধ হইল। স্বাধীন ত্রিপুরার আগরতলা রাজধানী হইতে প্রকাশিত হইতেছে, কাগজ ও ছাপা অতীব পরিপাটী। বিস্তৃত সমালোচনা পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

নবপ্রভা।—মাসিক পত্র, আমরা নিয়মিতরূপে এই পত্রিকাখানি প্রাপ্ত হইতেছি। ইহার প্রবন্ধগুলি হৃদয়গ্রাহী, উপযুক্ত সম্পাদকের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হওয়ায় নবপ্রভার প্রভা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে, একণে পত্রিকাখানি চিরস্থায়ী হইলে আমরা সুখী হইব।

নূতন পঞ্জিকা।—আমরা কুমারটুলীর সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন কবিভূষণ মহাশয়ের একখানি সন ১৩১০ সালের পঞ্জিকা উপহার পাইয়াছি। অন্যান্য কবিরাজগণের বিতরিত পঞ্জিকার মত ইহা বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ নহে। ইহাতে গৃহস্থের নিত্য আবশ্যকীয় সকল বিষয়ই আছে। উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট এক আনার টিকিট পাঠাইলে সকলেই পঞ্জিকা পাইবেন।



কবিরাজ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—আমাদের আলোচনা মাসিক-পত্রিকার সপ্তম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। উপহারের পুস্তক চারিখানি উপাদেয় উপন্যাস; প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ সত্বর টাকা পাঠাইয়া উপহার গ্রহণ করুন। যাঁহাদের নামে এখনও মূল্য বাকী আছে, আমরা এই মাসের মধ্যেই তাঁহাদের নিকট ভিঃ পিঃতে উপহার পাঠাইব; যাঁহাদের আপত্তি থাকে, তাঁহারা সত্বর জানাইবেন। নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া, আমাদিগকে বৃথা ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, ইহাই প্রার্থনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ।—পাঠক! কলিকাতার এই কবিরাজ মহাশয়কে কি আপনারা জানেন? ইনি বঙ্গদেশের স্বনামধন্য কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন। সামান্য দিনের মধ্যে কবিরাজী চিকিৎসায় ইনি যার-পর-নাই উন্নতি সাধন করিয়া, আমাদের আর্য্যচিকিৎসাশাস্ত্রের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়াছেন। ইনি কেবল আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পারদর্শী নহেন—ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রেও ইনি সুপণ্ডিত। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিও ইহার অনুরাগ যথেষ্ট; কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত "সাহিত্য সম্মিলন" সভার ইনি একজন বিশিষ্ট সভ্য। দরিদ্র রোগীগণের প্রতি ইঁহার সাতিশয় কৃপাদৃষ্টি আছে; প্রাতঃকালে সমাগত দরিদ্র রোগীগণকে ইনি বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা ও ঔষধ দান করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীর বরপুত্র নগেন্দ্রনাথের কোনওরূপ অহঙ্কার নাই। সমাগত লোক সকলের প্রতি নগেন্দ্রনাথের সাদর-সম্ভাষণ ও সুমিষ্ট আলাপন দেখিলে, বাস্তবিক তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। আমরা চিকিৎসা-বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে অশেষবিধ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্য এই সংখ্যায় তাঁহার একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল।

মাড়য়ারী এসোসিয়েশন।—বিগত ২১শে জুন রাত্রি আট ঘটিকার সময় এই সভার সুযোগ্য কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীহরিনারায়ণ ৪২ বৎসর বয়সে ইহ-

লোক ত্যাগ করিয়াছেন। পণ্ডিত [illegible] সাধারণ হিতকর কার্য্যে মুক্তহস্ত ছিলেন, তাঁহার স্বদেশে, [illegible] অন্তর্গত পাটনে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া সাধারণের জলকষ্ট দূর করিয়াছেন। কলিকাতা অবস্থানকালে তিনি দরিদ্র রোগীগণকে বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেন; এমন কি, সময়ে সময়ে পথ্যের খরচ পর্য্যন্ত প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার পীড়ার সময় কলিকাতার অনেক চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন; কুমারটুলীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয় ইহার চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরিশেষে মারবারী কুল-তিলক, দরিদ্র-বন্ধু ভজনলাল লোহিয়া মহাশয় হরি নারায়ণের জন্য ডাক্তার মরে সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই; সকলকে কাঁদাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। বিশেষ সমারোহের সহিত তাঁহার পূতদেহ শ্মশানঘাটে লইয়া দাহ করা হয়। পবিত্রহৃদয় ভজনলাল বাবু এই অকৃত্রিম বন্ধুবিয়োগে সাতিশয় শোক পাইয়াছেন, আমরা ঈশ্বরের নিকট তাঁহার কায়মনে শান্তি প্রার্থনা করি।

হানিম্যান হোম।—আজকাল আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বহুল প্রচলন হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থই ছোট ছোট বালক-বালিকাগণের অসুখ হইলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিনিয়া সেবন করান। এই জন্য কলিকাতায় ইহার অনেক দোকান হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, কলেজ ষ্ট্রীটস্থিত "হানিম্যান হোম" ঔষধালয়ের ঔষধ সকল বিশুদ্ধ ও আশুফলপ্রদ, ইহাঁদের কর্ম্মচারীবর্গও হিতৈষী। ক্রেতাগণকে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন, আমরা এই ঔষধালয়ের ক্রমোন্নতি প্রার্থনা করি।

প্রাপ্তি-স্বীকার।—"বসুধা" একখানি মাসিক পত্রিকা; নিয়মিতরূপে আমাদের হস্তগত হইতেছে। পত্রিকাখানির লেখা মন্দ হইতেছে না, ভবিষ্যতে ইহার উন্নতির আশা করা যায়। একণে পত্রিকাখানি স্থায়ী হইলে আমরা সুখী হইব।

সাহিত্য-সংহিতা।—কলিকাতা সাহিত্যসভার মুখপত্র "সাহিত্য সংহিতার" কয়েক সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। মাসিক পত্রখানি অনেকগুলি কৃতবিদ্য লেখক দ্বারা পরিচালিত; সংহিতার প্রবন্ধগুলি সারবান ও গভীর গবেষণাপূর্ণ। এই সংখ্যার পণ্ডিত শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের "কাল ও কালী" শীর্ষক প্রবন্ধটী আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। মাসিকপত্রখানি প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া, সাধারণের গোচরীভূত হইলে আমরা সুখী হইব।

সংসর্গ।

আসঙ্গলিপ্সা প্রাণীজীবনের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বশতঃই পিতা-পুত্রে, ভ্রাতা-ভগিনীতে, বন্ধু-বান্ধবে একত্র সহবাস লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ, একের সহিত অপরের সহবাসই সংসর্গের নিয়মাধীন। এই সংসর্গের গুণে বা দোষে, মানব কখন অনুপম স্বর্গীয় গুণাবলীতে বিভূষিত হইয়া, স্বর্গের দ্বারে উপনীত হইবার অধিকার লাভে সমর্থ হইতে পারে; আবার, পশুবৎ জ্ঞানহীন হইয়া, অধঃপাতের নিরয়গর্ভে প্রবিষ্ট হইবার দ্বার উন্মুক্ত রাখিবার নিমিত্ত সতত সচেষ্টও রহে। সংসর্গের উপর মানব-জীবনের এতাদৃশ ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করিতেছে বলিয়া, আমরা জন-সমাজে সৎ ও অসৎ এই দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এই দুই শ্রেণীর লোক যথাক্রমে সৎ ও অসৎ সংসর্গ হইতেই স্ব স্ব চরিত্র স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত অথবা পাপ কালিমায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সংসর্গ হইতে একদিনে বা অল্প সময়ে মানব-চরিত্রের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। পথ্যের গুণে বা দোষে রোগী যেরূপ ক্রমশঃ সবল বা দুর্ব্বল হইয়া জীবনী-শক্তি সংবর্দ্ধনে, কিংবা বিকট রাহুর করাল বদনে, এতদুভয়ের যে কোন মার্গে আপনাকে পরিচালনা করিতে পারে,—সংসর্গ হইতেও মানবচরিত্র ঠিক তদ্রূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বত্রই যে উভয়ভাবে চরিত্র গঠিত হয়, এরূপ নহে;—সংসর্গের ক্ষণিক মিলনেও মানব-চরিত্র যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা সৎ ও অসৎ সংসর্গ, এই দুইটী বিষয়ের বর্ণন-প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিষয়গুলি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

(১) সৎ-সংসর্গ।

সৎ-সংসর্গ বা সাধুজন-সহবাসে মানব স্বর্গীয় সোপানে আরোহণ করিতে করিতে গুরুজনে ভক্তি, অধ্যয়নে অনুরক্তি, সদাচার ও সদ্ব্যবহারে আসক্তি, সত্যের সমাদর, অসত্যের অনাদর, নিঃস্বার্থ পরোপকার, শক্তির সদ্ব্যবহার ইত্যাদি সাধুজনসমাদৃত অমূল্য গুণরত্নে আপনাকে বিভূষিত ও সুশোভিত করিয়া, মনোরম বেশে সকলের নয়নানন্দ বিধান করতঃ সরলতা, ধার্ম্মিকতা, সাধারণের হিতাসক্ততা—সুতরাং নির্ভীকতা প্রভৃতি সুসৈনিক ও সুসেনা-পতির সহায়তায়, সকল বাধা-বিপত্তি দূরে রাখিয়া, অনায়াসেই স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইয়া, স্বর্গীয় ভোগে পরিতৃপ্ত ও স্বর্গীয় সুখে জীবিতকাল অতি-বাহিত করিতে সমর্থ হয়।

সৎ-সংসর্গ, বিবিধ বাধা-বিপত্তি সমাকীর্ণ তরঙ্গায়মান কাল-সাগরের সুন্দর তরণী। উহার অবলম্বনে মানব অনায়াসেই জীবিতকালের অপর প্রান্তে উত্তীর্ণ হইতে পারে। কোনরূপ বাধা-বিপত্তি, তাহার সেই পথের অন্তরায়রূপে বড় একটা দণ্ডায়মান হয় না, যদি হয়, তাহা পূর্ব্বজন্মের কার্য্যফলের পরিণাম মাত্র।

সৎ-সংসর্গের ক্ষণিক মিলনে ও সদুপদেশরূপ সুধাপানে, নরহন্তা দস্যু রত্নাকর আজ অমরকবি বাল্মীকি নামে জগৎপূজ্য। যে রত্নাকর, সামান্ত অর্থের লালসায় ও পরিবারবর্গের দগ্ধোদর পরিপূরণের জন্ত, কত পুত্র-কন্তাকে পিতৃহীন করিয়াছে, কত অন্ধের যষ্টি, একমাত্র অবলম্বন প্রাণ-প্রতীম পুত্ররত্নের বিনাশ দ্বারা পিতামাতার হৃদয়ে দুঃখের আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে, কত সতী সাধ্বী রমণীরত্নকে বৈধব্যের অসহ যন্ত্রণা উপভোগ করাইয়াছে, যাহার নাম মাত্র স্মরণে বক্ষঃস্থল বারংবার স্পন্দিত হইত, হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যাইত এবং সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিত,—সেই রত্না-কর—সেই নরহন্তা দস্যু রত্নাকর, সাধুজনের ক্ষণিক সহবাস-লব্ধ সদুপদেশ-রূপ সুধাপানে তাপস-প্রধান বাল্মীকিনামে জগতে আখ্যাত। দয়া-মায়া যাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না, নরহত্যা যাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল, পাপ-পঙ্ক যাহার অঙ্গের সৌষ্ঠব ভীষণ দৃশ্যে পরিণত করিয়াছিল, সেই বাল্মীকি-হৃদয়ে—সেই পাষাণ সদৃশ বাল্মীকি-হৃদয়ে যখন—

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতম্॥"

এই শ্লোক প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তখন মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা।"

এই শ্লোকটী স্মৃতিপথে উদয় হয়, আর মনে হয়, সংসর্গ! তোমার ক্ষমতা অসীম। তুমি শুষ্কতরু পল্লবিত করিতে পার, নিরস অনুর্ব্বর মরুতে অমৃত ফলোৎপাদনের শক্তি ধর, এবং কখন বা জ্বালা-যন্ত্রণাময় পাপীর হৃদয়ে কলুষনাশিনী মন্দাকিনীর শান্তিধারা প্রবাহিত কর; তুমি কখন মানবকে দেবত্বে অথবা পশুত্বে আনয়ন করিয়া, তাহার জীবন-নাটকের অভিনয় দেখ। তোমার মহিয়সী শক্তি-প্রভাবে মানব কখন বানর সাজিতেছে, কখন বা বানর মনুষ্যত্ব পাইতেছে, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ও জ্ঞানীর জ্ঞান কোথায় চলিয়া যাইতেছে।—তাই বলি, সংসর্গ! তোমার ক্ষমতা অনন্ত, তুমি নিয়তই মানব-হৃদয়ের অসীম পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছ।

যখন একচক্রাপুরী বকাসুরের দারুণ উৎপীড়নে সন্ত্রস্ত ছিল এবং প্রতিদিন তাহার আহারের নিমিত্ত পর্য্যায়ক্রমে এক একটি সজীব মানব-দেহ প্রেরিত হইত, সেই সময়ে—সেই বকের ভয়ানক অত্যাচার সময়ে সপুত্রক কুন্তীদেবী একচক্রাপুরীনিবাসী কোন ব্রাহ্মণ-গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। একদিন মহা কোলাহল সমন্বিত দুঃখের মর্ম্মান্তিক বেদনা, সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত করিয়া, ঐ গৃহটী প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। কুন্তীদেবী অকস্মাৎ মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের কারণানু-সন্ধানের নিমিত্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী প্রাণাধিক পুত্র-কন্যাকে এবং পুত্র-কন্যা পূজ্যপাদ পিতামাতাকে রক্ষা করিয়া, পর্য্যায়ানুরোধে বকাসুরের খাদ্যরূপে প্রেরিত হইবার নিমিত্ত, স্ব স্ব বাসনা জানাইতেছে। কিন্তু মায়া-মমতা ও ভক্তির অনুরোধে, কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না; তাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ও অচিরেই অনর্থ সংঘটনের আশঙ্কা করিয়া, ক্রন্দন করিতেছে। তিনি এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ও আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; এবং আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ-পরিবারের পর্য্যায়রক্ষার্থ, রাক্ষস সমীপে নিজ পুত্র মধ্যে একটি প্রেরণ পূর্ব্বক স্বকীয় কোমল হৃদয়ের অন্তস্তলস্পর্শী গভীরতম বেদনায় পরিচয়দানকল্পে দয়াময়ী মূর্ত্তিতে সম-বেদনা জানাইতে বাসনা করিলেন। তাই,—তিনি পাষাণে বুক বাঁধিয়া,

মায়া-মমতাকে বিসর্জ্জন দিয়া, সরল মনে বলিয়া উঠিলেন, "হে বিপ্র! আপনারা আর ক্রন্দন করিবেন না। অদ্য আপনার পরিবার মধ্য হইতে কাহাকেও রাক্ষস সমীপে যাইতে হইবে না। আমিই আপনাদের পর্য্যায়রক্ষা করিব। আমার পঞ্চ পুত্রের মধ্যে একটি, অদ্য রাক্ষস সমীপে, প্রেরিত হইবে।" আশ্রিতা রমণীর মুখে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপ্র বলিতে লাগিলেন,—"আপনারা আমার অতিথি, বিশেষতঃ আমাদের প্রয়োজনে সেই অতিথির প্রাণনাশে আমাদিগকে অনন্ত নরকে ডুবিতে হইবে। অতএব এতাদৃশ কথা মুখে আনিবেন না। আপনার অসম্ভব অভিলাষ পরিহার করুন।" কিন্তু তথাপি কুন্তীদেবী স্বীয় অভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি বিশেষভাবে বুঝাইয়া, ও নিজ পুত্রদিগের বীরত্বের কথা শুনাইয়া, ব্রাহ্মণকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সম্মত করিলেন। শেষে মহাবীর ভীমসেন সমীপে সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিয়া, কুন্তীদেবী তাঁহাকেই রাক্ষস সমীপে প্রেরণ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! ভীমসেনের কি অসাধারণ ক্ষমতা! তিনি মাতৃ-অনুজ্ঞায় আনন্দিত ও যথাসময়ে বকাসুরের নিকট উপনীত হইয়া, মল্লযুদ্ধে তাহাকে বিনাশ করতঃ, আশ্রয়দাতার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের হৃদয়ে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত করিয়া, চিরদুঃখে মুহ্যমান নগরবাসীদিগকে আনন্দ-সাগরে ভাসাইয়া এবং ভূতলে অতুলনীয় কীর্ত্তি সংরক্ষণ পূর্ব্বক মাতৃচরণে প্রণত হইলেন। একচক্রাপুরী আজ সাধুসমাগমে বা সত্তের মিলনে নিষ্কণ্টক হইল, ব্রাহ্মণ-পরিবারের একটি জীবন রক্ষা পাইল; সংসর্গ বা সাধু সমাগমের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দিক্‌দিগন্তে প্রচারিত হইল।

(২) অসৎ-সংসর্গ।

গৃহের একপ্রান্তে বিন্দুমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইলে যেমন ক্রমেই তাহা নিজ অধিকার বিস্তার দ্বারা ভীষণাকারে প্রজ্বলিত হইয়া সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তিতে নিকটবর্ত্তী গৃহাদিও দগ্ধ করিয়া থাকে, অসৎ সংসর্গও সেইরূপ একটি মানব-হৃদয় হইতে মানব-সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, নানারূপ উপদ্রব সাধন করে। অসৎ-সংসর্গের অজ্ঞাত মিলনে, চোরজালে ধ্যানমগ্ন মাণ্ডব্য মুনিকেও রাজার আদেশে শূলাগ্রে চড়িতে হইয়াছিল। অসৎ-সংসর্গ হইতেই ভরত মুনির ঐশপ্রেমে ব্যাঘাত পড়িয়াছিল। দুর্য্যোধনের দুর্ম্মতি ঘটিয়া-

ছিল; তাঁহার পিতার সাধু অন্তরেও বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। তাই বলি, সংসর্গ! তুমি সব পার, তোমার ক্ষমতা অনন্ত; প্রাণীজগতে তোমার শক্তি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। মানব তোমার শক্তিবর্ণনে অশক্ত।

এক্ষণে আমরা সৎ ও অসৎ সংসর্গ সম্বন্ধীয় একটি গল্পের উল্লেখ পূর্ব্বক আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বৈশাখ মাস, দারুণ রৌদ্র, মার্ত্তণ্ডের প্রখর প্রভা যেন অগ্নিকণার ন্যায় অনুভূত হইতেছে, শরীরের জলীয় অংশ বাষ্পাকারে অপহৃত হইয়া, আবশ্যক জলীয় ভাগের অভাব তৃষ্ণারূপে বিজ্ঞাপিত করিতেছে। এতাদৃশ গ্রীষ্মের সময়ে একটি পথিক কার্য্যানুরোধে কোনস্থানে গমন করিতে ছিলেন। পথিমধ্যে তৃষ্ণা আসিয়া তাঁহার জলপানের আশা উদ্দীপিত করিয়া দিল। তিনি জল অন্বেষণে গমন করিতে করিতে অনতিদূরে একটি গৃহ দেখিতে পাইলেন এবং তথায় আকণ্ঠ জলপান দ্বারা তৃষ্ণা দূর করিবেন আশায়, আনন্দে অধীর হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। পরে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় লম্বমান পিঞ্জরে আবদ্ধ একটি শুক পক্ষী, মধুর আলাপে তাঁহাকে আপ্যায়িত করণোদ্দেশে বলিতেছে,—"কে তুই? এখানে কি জন্য আসিয়াছিস্? শীঘ্র এখান হইতে দূর হ', নচেৎ ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইব।" ইত্যাদি বাক্য সমূহ শ্রবণ করিয়া, পথিক আশ্চর্য্যান্বিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, অপূর্ব্ব চিন্তাসাগরে ভাসিতে ভাসিতে শুষ্ককণ্ঠে এক অরণ্যপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অদূরে অরণ্য মধ্যস্থিত একটি কুটির তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। জলপান ইচ্ছায় তিনি তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং দেখিলেন, তথায় কেহই নাই। কেবল তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত পক্ষীটির সদৃশ একটি পক্ষী দ্বারদেশে বিরাজিত রহিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ইহার মুখে সেরূপ কর্কশ ও কটুভাষা নাই। বস্তুতঃ ইহার মৃদুমন্দ ব্যবহার, আতিথ্যসৎকারার্থ অতি বিনীত বচনে পথিককে বলিতে লাগিল,—"মহাশয়! দেখিতেছি, আপনি বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, অতএব এই কুটির মধ্যে কুশাসন রহিয়াছে, তাহা বিস্তৃত করিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করুন। তৎপরে গৃহস্থিত ঐ কমণ্ডলুজলে পাদ প্রক্ষালন করতঃ কোষাকুষি লইয়া আহ্নিকাদি সমাপন করুন। গৃহে অন্য খাদ্য কিছুই নাই, তবে কিছু ফল মূল রহিয়াছে, আহ্নিকান্তে তাহাই গ্রহণ করিয়া জল পান করুন।" ইত্যাদি সাধুজন ব্যব-

ছত্ত বাক্যাবলী পক্ষীর মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে দেখিয়া, পথিকের কৌতূহল সহকৃত পূর্ব্ব চিন্তাস্রোত অধিকতর প্রবলভাব ধারণ করিল। পরিশেষে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"পক্ষিন্! আমি তোমার বাক্যে পরম পরিতৃপ্ত, আশ্চর্য্যান্বিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। অতএব অগ্রে তুমি আমার কৌতূহল নিবারণ কর, পরে তুমি যাহা যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব।" এই বলিয়া পথিক, অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনাবলী, পক্ষী সমীপে বিবৃত করিয়া বলিলেন,—"হে পক্ষীপ্রবর! আমি দেখিলাম, তোমরা উভয়েই একশ্রেণীর পক্ষী, কিন্তু তথাপি তোমাদের মধ্যে এরূপ পার্থক্য কেন?—তুমি সুমধুর বাক্য দ্বারা আমাকে আপ্যায়িত করিলে, আর সে অসাধু কর্কশ ব্যবহারে আমাকে দুর করিয়া দিল। ইহারই বা কারণ কি?" তখন পক্ষী তাহার প্রশ্নের উত্তরদানকল্পে বলিতে লাগিল;—

"মাতাপেকা পিতাপেক মম তস্যচ একভিঃ
অহং মুনিভিরানীত সচানীত গবাসনৈঃ,
অহং মুনিনাম্ বচনং শৃণোমি
স চ শৃণোতি গবাসনৈঃ,
এতস্য বিষয়ে ন তস্য দোষঃ নচ মে গুণাঃ
সংসর্গজা দোষা গুণা ভবন্তি।"

অর্থাৎ আমরা উভয়েই এক পিতামাতা হইতে উৎপন্ন হইয়া, আমি মুনি কর্ত্তৃক এখানে আনীত হইয়াছি এবং সে চণ্ডাল কর্ত্তৃক তথায় নীত হইয়াছে। আমি মুনিদিগের বাক্য শুনিয়া থাকি, আর সে চণ্ডালদিগের বাক্য শুনিয়া থাকে, এবং তদনুসারেই আমরা উপদিষ্ট হইয়াছি। অতএব এ বিষয়ে তাহারও কোন দোষ নাই, আমারও কোন গুণ নহে। সংসর্গ হইতেই সকল দোষগুণের উৎপত্তি। (ক্রমশঃ)

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভণ্ডের ভগবদ্ভক্তি। *

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।]

তৃতীয় স্তবক।

তিন বৎসর গত হইয়া গিয়াছে। অদ্য চতুর্থ বৎসরের প্রথম দিন। লক্ষ্মীমণি, গত কল্য পিতৃভবন হইতে রামনগরে আগমন করিয়াছেন। ইনি ও ইহাঁর ভর্ত্তা ভিন্ন ইঁহাদের পরিবারে অন্য লোক কেহই ছিল না, পাঠক মহাশয়, এ কথা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। পতি প্রবাসগত,—সুতরাং যুবতী স্ত্রীলোকের সুদীর্ঘকাল একাকিনী শ্বশুরালয়ে বাস, বিপজ্জনক বিবেচনায়, তিনি, পিতামাতার আশ্রয়ে থাকা, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বোধ করিয়া, সেই স্থানেই গমন করিয়াছিলেন। অদ্য তাঁহার পতির দেশে আসিবার কথা,—তজ্জন্য গত কল্য এখানে আসিয়াছেন। পূর্ব্ব পরামর্শ অনুসারে অদ্য গ্রামসন্নিহিত শ্মশানে তাঁহার পতির সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

পতিগতপ্রাণা লক্ষ্মী যে স্বামীকে মুহূর্ত্তমাত্র না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, আজ তিন বৎসর হইল, তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে,—সুতরাং, তাঁহার এখনকার অবস্থা, সহজেই অনুমেয়। এতদিন কোন প্রকারে মনের আবেগ সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু, আজ তাঁহার প্রাণেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, বহুদিনের পর আজ তাঁহার হৃদয়-দেবতার সুশীতল পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বিষম বিরহের মর্ম্মধ্বংসী মুর্ম্মুর দাহন নির্ব্বাপিত করিবেন, হঠাৎ এই আশার উত্তেজনা প্রবলতর হওয়ায়, তাঁহাকে যার-পর-নাই ব্যাকুলিতা করিয়াছে। পতিবিরহিত হইয়া, জীবন-যাপন করা, সতী নারীর পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র,—এজন্য লক্ষ্মীমণি একদিন আত্মহত্যা করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন,—কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ—পরে এই আশঙ্কা বলবতী হওয়ায়, সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। গঙ্গার ঘাট হইতে শ্মশানভূমি অধিক দূরবর্ত্তী নহে, আজ দিবাভাগে জল আনিবার ছলে, লক্ষ্মী পাঁচ ছয়বার তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকবারই শ্মশানের দিকে সোৎসুকনয়নে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু একটী মানবমূর্ত্তিও তাঁহার নেত্রপথে পতিত হয় নাই; সেজন্য তাঁহার ভাবনার আর পরিসীমা

* বিগত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় ভ্রমক্রমে "ভণ্ডের ভগবদ্ভক্তির" স্থলে "ভক্তের ভগবদ্ভক্তি" ছাপা হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

ছিল না। আজ তাঁহার স্বামীর নিশ্চয়ই এখানে আসিবার কথা,—তবে এমন কেন হইল? হায় হায়! তবে কি অভাগিনীর জীবনসর্ব্বস্ব জীবিত নাই? তবে কি সেই তিন বৎসরকাল প্রকৃতই তাঁহার পক্ষে কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল? লক্ষ্মীর ইহজীবনের লীলাখেলা, তবে কি সত্য সত্যই ফুরাইয়া গেল?—যদি তাহাই হয়, এ জীবনে আর ফল কি? পতিহীনা নারীর বিফল দেহভার বহনে আর ফল কি? লক্ষ্মী নিশ্চয়ই আজ জাহ্নবী-জলে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন।

নিশীথ রজনী। নিদ্রার শান্তিময়ী ক্রোড়ে জগৎ সুসুপ্ত। রামনগরের যাবতীয় নরনারী গাঢ় তন্দ্রাঘোরে বিচেতন। নিবিড় তমসে, ভাগীরথী-তীরভূমি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কোথায়ও একটি মাত্র প্রাণীর কণ্ঠধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে না; কেবলমাত্র সমীপস্থ শ্মশানভূমির দিক্ হইতে দুই চারিটী নরমাংসাশী শৃগালের বিকট নিনাদ মধ্যে মধ্যে অনন্ত আঁধারগর্ভ আলোড়িত করিয়া, কিয়ৎ পরিমাণে নৈশ নিস্তব্ধতার গম্ভীর ভাব ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। জগৎ সুষুপ্তদেবীর অধিকারভুক্ত হইলেও, কিন্তু তিনি, লক্ষ্মীমণিকে আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ঐ দেখুন পাঠক, লক্ষ্মীমণির নয়নে নিদ্রা নাই। এই ঘোর নিশীথে—এই সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকারে—তিনি পতিসন্দর্শন লালসায়, শবকঙ্কাল-সমাচ্ছন্ন বিকট-দর্শন শ্মশানভূমিতে গমন করিবার জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যিনি রাত্রিকালে একাকিনী ঘরের বাহির হইতে পারিতেন না, আজ সেই ভয়প্রবণ-হৃদয়া রমণী, মহাসাহসে বুক বাঁধিয়া, স্বচ্ছন্দমনে শ্মশানগমনে সমুৎসুক! লক্ষ্মীর হৃদয়ে প্রেত-পিশাচের বা হিংস্র জন্তুর ভয়, তত প্রবল ছিল না, কিন্তু পাছে কোন দুর্বৃত্ত লম্পট কর্তৃক তাঁহার সতীধর্ম্মে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কাই সমধিক বলবতী হইয়াছিল। যাহা হউক, তিনি সকল ভয়ে বিসর্জ্জন দিয়া, একমাত্র পতির প্রেমময় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে সেই গভীর অন্ধকারে পথপর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হস্তে একটি ভগ্নলণ্ঠন, এক বাক্স দীপশলাকা এবং একটা কেরোসিনের ল্যাম্প। আলোকহস্তে যাইলে, পাছে কাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়েন, এই ভয়ে ল্যাম্পটি প্রজ্বালিত করেন নাই। অনেক পথ অতিক্রান্ত হইল,—এইরূপে চলিতে চলিতে হঠাৎ একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, বোধ হইল, কি একটা কঠিন পদার্থ পদতলে বিদ্ধ হইয়াছে; হস্তস্থিত

দীপশলাকা সাহায্যে অমনি ল্যাম্পটী প্রজ্বালিত করিলেন,—দেখিলেন, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড নরকঙ্কাল। নর-কঙ্কালের উন্মুক্ত দশনপংক্তি এবং ভয়াবহ মুখমণ্ডলদর্শনে লক্ষ্মী চমকিত হইয়া উঠিলেন, বুকটা ধ্রাস্ ধ্রাস্ করিতে লাগিল। যাহা হউক, তিনি ইহাতে সাহস হারাইলেন না,—বুঝিতে পারিলেন, এইবার শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আবার চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর, আবার তাঁহার গতি বন্ধ হইল, কিসের একটা খট্ খট্ শব্দ আসিয়া যেন কর্ণে বাজিল। কোন্‌দিক হইতে শব্দটা আসিতেছে, অবগত হইবার বাসনায়, কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে দণ্ডায়মান থাকিলেন; স্পষ্টই উপলব্ধি হইল, শব্দটা শ্মশানসীমার বহির্ভূত নহে। কোন্‌দিক হইতে আসিতেছে, তাহাও ক্রমে নির্ণীত হইল। কেন শব্দ হইতেছে? কিসের শব্দ? নিশ্চয় ওখানে মানুষ আছে? শব্দটা নিশ্চয়ই মনুষ্যকৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই;—মনে মনে এইরূপ নানা বিতর্ক করিয়া স্থির করিলেন, জানিতে হইবে—ব্যাপারটা কি? মৃদুপাদবিক্ষেপে, অমনি তাহার অনুসরণ করিলেন। লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—একটা মৃতদেহ! কতকগুলা শৃগাল, কাড়াকাড়ি করিয়া, উহা হইতে মাংস ভক্ষণ করিতেছে। শৃগালগুলার টানাটানিতে, শবটার মস্তকদেশ ভূমির উপর বারংবার উত্থিত পতিত হওয়ায়, প্রাগুক্ত শব্দের উৎপত্তি হইতেছিল। লক্ষ্মীকে আলোকহস্তে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া, উহারা মাংসভক্ষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। লক্ষ্মীও ক্ষুণ্ণহৃদয়ে দিক পরিবর্ত্তন করিলেন। ক্রমশঃ সমস্ত শ্মশানভূমিই তাঁহার পরিদর্শন করা হইল; কোথাও স্বামীর অনুসন্ধান পাইলেন না। হতাশা-রাক্ষসী বিকটাস্য বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিল। একে অনাহার অনিদ্রায় অবসন্নদেহ, তদুপরি নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে পতির দর্শন না মিলায়, মহাদুর্ভাবনায় মৃতকল্প হইয়া পড়িলেন। গমন-শক্তি সংহ্রিয়মাণ হইয়া আসায়, লণ্ঠনটি ভূমিতলে রাখিয়া, সেইখানেই উপবেশন করিলেন। জলদজাল সমাচ্ছন্ন অমানিশার ন্যায়, ভাবনার পর ভাবনা আসিয়া, তাঁহার হৃদয়াকাশকে ভীষণাকার করিয়া তুলিল। একবার ভাবিতেছেন,—তাঁহার প্রাণেশ্বর বুঝি জীবিত নাই, জীবিত থাকিলে, নিশ্চয়ই এখানে আসিতেন। আবার ভাবিতেছেন,—এখনও অনেক রাত্রি আছে, হয় ত আর একটু বিলম্বেও আসিতে পারেন;

পরক্ষণেই আবার ভাবিতেছেন,—হয় ত তিনি এইখানেই আছেন, বোধ হয়, ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা হয় নাই, আর একবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে আবার গাত্রোত্থান করিলেন, আবার পূর্ব্ববৎ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। খানিক দূর যাওয়ার পর, কিসের একটা খস্ খস্ শব্দ কর্ণে বাজিল, বোধ হইল, কে যেন পাছু পাছু আসিতেছে। পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন—লণ্ঠনের আলোক-রেখা অনেকদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে—একটি প্রাণীও চক্ষে পড়িল না। আবার চলিতে লাগিলেন, খানিক যাওয়ার পরই, আবার সেই শব্দ। এবার যেন শব্দটা কিছু স্পষ্টতর,—আবার পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, কেহই নাই! লক্ষ্মীর মনটা এবার কিছু ছাঁৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিল;—ভাবিলেন, একি! এমন হইতেছে কেন? এটা কি তবে ভৌতিক কাণ্ড নাকি? বোধ হয় তাই—নচেৎ মানবিক ব্যাপার হইলে, অবশ্যই দৃষ্টিগোচর হইত সন্দেহ নাই। আবার ভাবিলেন,—শুনিয়াছি, চিত্তের উন্মত্ততা জন্মাইলে অথবা মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে, মানবের অনেক ভুল ভ্রান্তি ঘটে—সত্য অসত্য এবং অসত্য সত্য প্রতীযমান হয়,—বোধ হয়, নানা কারণে আমারও মস্তিষ্কবিকার জন্মাইয়া থাকিবে,—আর সেইজন্যই বুঝি পুনঃ পুনঃ এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। বহু বিতর্কে শেষ ব্যাপারটা অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। আবার গন্তব্য পথের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইবামাত্র আবার সেই শব্দ।—বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট পাদবিক্ষেপধ্বনি। মস্তিষ্ক বিকৃতির অলীক অনুভূতি বলিয়া, এবার আর তিনি উহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না—বুঝিতে পারিলেন—নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে,—ভীত চকিতনয়নে একবার পার্শ্বের দিকে চাহিলেন। কি ভীষণ দৃশ্য! দেখিলেন, তাঁহার ছায়ার পশ্চাতে আর একটা ছায়া আসিতেছে!! মহাতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল—শরীরের সমস্ত শোণিত যেন, হৃদ্‌পিণ্ডের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গ শবাকারে পরিণত করিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী গমনে বিরত হইয়া, অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে একবার পশ্চাতের দিকে চাহিলেন। কি দেখিলেন? লক্ষ্মী দেখিলেন, একটা বিকটাকার প্রেতমূর্ত্তি বাহু বিস্তার করিয়া, তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত!! অমনি,—"বা—বা গো—ও! হা—স্বা—মি—ন্। কো—থা—য়—ই—লে!" এই কয়েকটি কথা

উচ্চারণ করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, প্রেতমূর্ত্তিটা দ্রুতগতি তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। লণ্ঠনের আলোকটা অনির্ব্বাপিত অবস্থায় ছিল, প্রেতটা তাড়াতাড়ি তাহা উত্তোলন করিয়া, মূর্চ্ছিতার মুখমণ্ডল সমীপে ধরিল এবং তাঁহার মুখের দিকে আপনার ভীষণ মুখখানি ঈষৎ অবনত করিয়া, নানারূপ ভঙ্গিমা-সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

পাঠক মহাশয়, বোধ করি ভাবিয়াছেন,—লক্ষ্মী নিশ্চয়ই ভূতাক্রান্ত হইয়াছেন। প্রেতমূর্ত্তি হয় ত এইবার তাঁহার ঘাড়টি মোচ্ড়াইয়া মনের সুখে রুধির পান করিবে!—কিন্তু বাস্তবিক ওটা প্রেতযোনী নহে। উহার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি প্রেতানুযায়ী হইলেও গাত্রে নরচর্ম্মের আচ্ছাদন আছে। ঐ দেখুন! উনিই আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত রাজকন্যা-দর্শনাতুর লক্ষ্মীবল্লভ শ্রীমান্ উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উমেশের সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই,—এইবার তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথার আলোচনা করিব।

চিন্তাপীড়িত শ্রীমান্ উমেশচন্দ্র, লক্ষ্মীমণির নিকট বিদায় লইয়া, নির্ব্বাসনদণ্ডগ্রস্ত অপরাধীর ন্যায় একেবারে বহুদূর গমন করেন। গমন-কালে অবশ্যই গৈরিকবস্ত্রগুলি লইয়া যাইতে ভূলেন নাই। গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিয়া যাইলে, কোন পরিচিত ব্যক্তি, তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া, পাছে চিনিয়া ফেলে এবং তজ্জন্য তাঁহার ভাবী ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মায়, এই ভয়ে সেগুলিকে একটা বোচ্কাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। তারপর, যখন দেখিলেন, অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছেন,—আর সেরূপ কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন একটা নির্জন স্থানে যাইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করেন এবং পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি একটা জলাশয়ে নিমগ্ন করিয়া রাখেন। সন্ন্যাসীর আনুসঙ্গিক অপরাপর আস্বাবপত্রগুলি, নানাস্থান পরিভ্রমণকালে ক্রমে ক্রমে সংগৃহীত হয়। তিন বৎসরের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের বহুতর স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা হরিদ্বার শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থস্থান সমূহও এই সুযোগে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সুবিশাল ভারতের বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্যাবলী সন্দর্শনে এবং নানা তীর্থপর্য্যটনে, তাঁহার মন যদিও অনেকটা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু রাজকন্যার দর্শন লালসা,

তাঁহার হৃদয় হইতে ক্ষণকালের জন্যও অন্তর্হিত হয় নাই। পত্নী লক্ষ্মীমণির পরামর্শানুসারে বর্ষত্রয় প্রবাস বাস করিয়া, অদ্য সেই লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য পতি রামনগরে আসিয়াছেন। সন্ধ্যা অতীত হইলে, গ্রামের ভিতর প্রবেশ করেন এবং রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত একটা জনশূন্য স্থানে অবস্থিতি করিয়া, পরে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই লক্ষ্মীমণি এখানে আসিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী আসিয়া দেখিলেন, আলোকহস্তে একটা লোক শ্মশানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভাবিলেন, কেহ হয় ত মৃতদেহ লইয়া আসিয়াছে; অথবা হয় ত আমার ন্যায় আরও কোন গুণধর আছেন, নচেৎ এত রাত্রে আর কাহার শ্মশানে আবশ্যক পড়িয়াছে? যাহা হউক, ব্যাপারটা কি, জানিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহল হওয়ায় কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, একটা স্ত্রীলোক।—স্ত্রীলোক! এই মহানিশীথে, নিবিড় আঁধারে স্ত্রীলোক! তাহাতে আবার একাকিনী! কি সাহস!! কি বুকের পাটা!! লোকটা কে? কি করিতে আসিয়াছে? ভাল, আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখা যাউক। এই ভাবিয়া আরও একটু অগ্রগামী হইলেন। এইরূপে অধিক নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, সন্ন্যাসীর ছায়া, লক্ষ্মীমণির দৃষ্টিগোচর হয় এবং পরিশেষে সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ায়, আলো আঁধারে তাঁহার প্রকৃতমূর্ত্তি নির্ণয় করিতে না পারায়, লক্ষ্মী পিশাচবোধে, বিভিষিকায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

সন্ন্যাসী, প্রথমতঃ লক্ষ্মীমণিকে চিনিতে পারেন নাই,—কিন্তু লক্ষ্মী যখন ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, তখন লোকটা কে, অনেকটা বোধগম্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ,—লক্ষ্মী সংজ্ঞাহীনা হইয়া ভূপতিতা হইলে যখন লণ্ঠনের আলোকটি তাঁহার মুখমণ্ডলসমীপে লইয়া গিয়া, ভাল করিয়া দেখিলেন, তখন আর তাঁহার মনে অনুমাত্র সংশয় রহিল না; কমণ্ডলুতে জল ছিল, তদ্দ্বারা মূর্চ্ছিতার চোকমুখ এবং মস্তকদেশ সিক্ত করিয়া দিলেন। খানিকক্ষণ শুশ্রূষার পর, লক্ষ্মীর জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল। সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলে, পাছে তাঁহাকে দেখিয়া আবার ভয় পান, এজন্য তাঁহার সংজ্ঞা হওয়ায় পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাসী,—"লক্ষ্মী লক্ষ্মী!" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

লক্ষ্মী চেতনালাভ করিয়াই, প্রেতমূর্ত্তির মুখনিঃসৃত চিরপরিচিত সুমধুর

ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বর্গে আছেন, কি মর্ত্তে আছেন, সুপ্ত আছেন, কি জাগ্রত আছেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সত্যই কি এ তাঁহারই কণ্ঠস্বর!! সত্যই কি ইনিই তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব! সত্যই কি এতদিনের পর তাঁহার প্রাণপতি তাঁহাকে "লক্ষ্মী" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন!!—লক্ষ্মী, নয়ন উন্মীলন করিলেন, অমনি পুরোভাগে সেই বিকটমূর্ত্তি দৃষ্টিপথারূঢ় হইল,—আবার নয়ন মুদ্রিত করিলেন, দারুণ ভয়ে বুকের ভিতরটা দুরু দুরু গুরু গুরু করিয়া উঠিল।

অন্ধকার রাত্রিতে বাস্তবিকই সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিটা বিকটদর্শন হইয়াছিল। তাঁহাকে উমেশ বলিয়া চিনিবার কোন উপায়ই ছিল না। সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিকবসন, গলদেশে দোদুল্যমান নরঅস্থিমালা, আনাভী-বিলম্বিত সুদীর্ঘ শ্মশ্রুজালে মুখমণ্ডলের ভূরিভাগ সমাচ্ছাদিত, মস্তকদেশে সুদীর্ঘ জটাভার উষ্ণীষাকারে বিনিবদ্ধ, ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক, হস্তে সিন্দুররঞ্জিত প্রকাণ্ড ত্রিশূল। কে বলিবে, ইনিই সেই উমেশ? লক্ষ্মীকে তদবস্থ দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"লক্ষ্মী! আর তোমার ভয়ের কারণ নাই, আমিই তোমার স্বামী উমেশ। আমার এক্ষণে সম্পূর্ণ নূতন বেশ; সুতরাং এ বেশ দেখিয়া, তুমি এখন আমাকে কোনরূপেই চিনিতে পারিবে না। অতএব, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর—নিশ্চয়ই বলিতেছি, আমিই তোমার স্বামী।"

লক্ষ্মী, উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। যদি ইনি তাঁহার স্বামী হয়েন, তবে ইঁহার বারংবার অনুরোধসত্বেও অবাধ্য হওয়াটা দোষের বিষয় সন্দেহ নাই, আর যদি ইনি তাঁহার স্বামী না হয়েন, তাহা হইলে কি বিষম বিপদের কথা,—ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প হয়। যাহা হউক, অনেক ভাবনার পর তাঁহার মনে পড়িল,—তাঁহার স্বামীর বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে একটী আঁচিল আছে, যদি ইঁহার হস্তে সেইরূপ চিহ্ন থাকে, তবে ইনিই যে তাহার স্বামী, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। লক্ষ্মী বলিলেন, "আপনার বামহস্তখানি একবার আমার সম্মুখে ধারণ করুন।" সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, আচ্ছা এই দেখ।"

লক্ষ্মী দেখিলেন, আঁচিলটী যথাস্থানেই রহিয়াছে। তখন আর তাঁহার কোন সংশয়ই থাকিল না। তাড়াতাড়ি ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া, মহা

আবেগে পতির গলদেশ ভুজবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—এ কি তুমি !! তুমিই আমার জীবনসর্ব্বস্ব !! তুমিই এতক্ষণ এখানে এসেছ !! অভাগিনী আমি—আমি এতক্ষণ আপন ধন চিনে নিতে পারি নাই! ধিক্ আমার, ধিক্ আমার জীবনে!" মহাহর্ষে মহাপুলকে লক্ষীর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিতধারে প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল। বহুদিন বিচ্ছেদের সতী, হারাপতি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে ডুবিয়া গেলেন। বিরহ-সন্তপ্ত দম্পতির শ্মশানে সুমিলন হইল। তৎপরে বিচ্ছেদকাল পরস্পর কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছেন, বলাবলি করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত কথা বলা শেষ হইলে উমেশ বলিলেন,—"লক্ষী! সমস্তই ত হ'ল—তুমি যা' যা' কর্‌তে ব'লেছিলে, সমস্তই ত এক প্রকার শেষ করা গেল, এক্ষণে রাজকন্যা দর্শনের আর কতদূর?—কতদিন পরে সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি-খানি দৃষ্টিগোচর হবে?"

লক্ষী। শীঘ্রই দেখ্‌তে পাবে,—আর পাঁচ ছয় দিন মাত্র অপেক্ষা কর। অনেক কষ্ট সহ্য করেছ, এই ক'টা দিন কোন রকমে ক্ষেপণ কর। শ্মশানে এসে যে অবস্থায় থাক্‌তে হবে, যা' যা' কর্‌তে হবে, তোমাকে পূর্ব্বেই সব ব'লে দিয়েছি, বোধ করি, তোমার স্মরণ আছে?

সন্ন্যাসী। সমস্ত মনে আছে—কিছুই ভুলি নাই।

লক্ষী। আর সে সব কথার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। তবে এখনকার মত দাসীকে বিদায় দাও। তোমার নিকট হ'তে বাড়ী যেতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না। কিন্তু এদিকে রাত্রি প্রভাত হ'য়ে আস্‌ছে; আমি এখানে থাক্‌লে, তোমার অভীষ্ট সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাক্‌বে না, লোক জানাজানি হবে,—এই ভয়েই অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হচ্ছে। কাল রাত্রে আবার যথাসময়ে দেখা হবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়।

কবিবর হেমচন্দ্রের

স্বর্গারোহণোপলক্ষে শোকোচ্ছ্বাস।

(১)

অন্ধকবি হেমচন্দ্র অন্ধকার কবি,
অস্তমিত হইলেন চিরদিনতরে ;
বাঙ্গালীর হতভাগ্য বন্ধুবিনে আজ
শোকেতে অধীর হয়ে অশ্রুপাত করে।

(২)

আজীবন হিতব্রতে রাখি নিজ মন,
সেধেছেন স্বদেশের উন্নতি লাগিয়া ;
আজ সেই বঙ্গমাতা হেমমণি বিনে
করাঘাত করে বুকে অশ্রু বরষিয়া।

(৩)

উজ্জ্বল রতনতুল্য ভারত-গৌরব,—
কেন রে হরিলি বিধি অমূল্যরতনে ?
কি দোষেতে হেমচন্দ্রে রাহুরূপ ধরি'
করিলে রে সর্ব্বগ্রাস এ ঘোর দুর্দ্দিনে ?

(৪)

যাও তুমি হেমচন্দ্র যাও স্বর্গধামে !
কবিতা-কাননভূমি সেখানেও আছে।
দুঃখদগ্ধ বঙ্গভূমি করি পরিহার,
স্বর্গধামে সুখে থাক দেবেন্দ্রের কাছে।

(৫)

তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি রহিবে অটল,—
চন্দ্রসূর্য্যসম এই ভারত-গগনে ,
তোমার যশের গীতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে—
গাহিবে দুঃখের দিনে বঙ্গবাসীগণে।

(৬)

তোমার কবিতা-সুধা যে করিবে পান,
ভুলিবে না কোনকালে সে মধুর রস ;
হৃদয় মাতিয়া যাবে কাব্য রসঘোরে,
সবল হইবে দেহ ঘুচিয়া অবশ।

(৭)

তোমার কাব্যের পুষ্প বঙ্গের উদ্যানে,
রহিবে অনন্তকাল হ'য়ে বিকসিত।
দিবে চির পুষ্পাঞ্জলী অঞ্জলি ভরিয়া
ভারত-মাতার পদে বঙ্গবাসী যত।

(৮)

যাও তুমি হেমচন্দ্র বৈকুণ্ঠ-বাজারে !
তথায় পাইবে বহু কাব্য অলঙ্কার !
মাতৃদত্ত তব বীণা দেবের সভায়
সপ্ত-তানলয়ে আজ ছাড়িবে ঝঙ্কার।

(৯)

মুগ্ধ হ'য়ে দেবগণ তোমার সঙ্গীতে,
কোলেতুলে লবেতাঁরা স্নেহ আলিঙ্গনে
দেবস্পর্শে দিব্যচক্ষু লভি পুণ্যবলে,
মহাসুখে রবে তুমি বৈকুণ্ঠ-ভবনে।

(১০)

মর্ত্তেতে সম্মান লাভ হ'ল না বলিয়া,
দুঃখিত হ'য়োনা তাহে ওহে কবিবর !
খনির তিমির গর্ভে জন্মে থাকে মণি ;
তুমিও তদ্রূপ ছিলে বঙ্গের ভিতর।

(১১)

চেয়ে দেখ, বঙ্গমাত শোকাতুরা হ'য়ে
বুকেতে হানিয়া কর বলিছে কাতরে,
কোথারে অমুল্যনিধি কোথাগেলি বাপ
মাতারে ভাসালি আজ অকুল পাথারে

(১২)

তোমার গুণের কথা কি কহিব বাছা
মাতৃসেবা ছিল তোর চিরন্তন ব্রত,
মোর জন্য কেঁদে কেঁদে হয়েছিলি অন্ধ।
ভিখারিণী বঙ্গমাতা কহিবে তা'কত ?

(১৩)

একে একে প্রিয় পুত্র হারালেম সব,
দগ্ধ হৃদে স্নিগ্ধবারি কে সিঞ্চিবে আর?
শোকাতাপা জননীরে সান্ত্বনাবাক্যেতে
মৃতপ্রাণে কে করিবে জীবনি সঞ্চার ?

(১৪) [কোলে,

কোলজোড়া পুত্র তুই ছিলি মোর
অকালে চলিয়া গেলি ছলিয়া মাতারে!
এতদিনে মাতৃকোল শূন্য হ'ল তোর !
ডুবিল সুখের শশী কালের সাগরে।

(১৫)

আশীর্ব্বাদ করি তোরে ও হেমরতন।
অমর হইয়া থাক ত্রিলোক মাঝেতে।
কবিনামে ধন্য হবি পাবি মোক্ষফল,
উদিবে যশের রবি আঁধার ভারতে।

(১৬)

শুনিলে ত কবিবর মাতৃআশীর্ব্বাদ ?
ফলিবে যে ধ্রুবসত্য জননী বচন ;
বঙ্গের আবালবৃদ্ধ তব পাদপদ্মে,
হৃদয়ের ভক্তিবারি করিবে সেচন।

শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়।

উদক-ক্রিয়া।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

যাহারা বলে, "মরা গরু ঘাস খায় না", তাহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। যাহারা চার্ব্বাক মুনির মতাবলম্বন করিয়া অথবা অশাস্ত্রীয় ইউরোপীয় সভ্যতা বা বিজ্ঞানের সুতীব্র আলোকে হিন্দুর সমুদয় ক্রিয়াকে অর্থশূন্য বিবেচনা পূর্ব্বক বলিয়া থাকে, "গতাসু পিতা বা মাতা অথবা পূর্ব্বপুরুষগণ কঠিন বা তরল কোনও দ্রব্যই আহার করিতে পারে না, বিশেষতঃ মর্ত্তে প্রদত্ত পার্থিব দ্রব্যাদি স্বর্গে পৌছিতে আদৌ সমর্থ হয় না" ; এতাদৃশ অভক্ত, ভ্রষ্ট, দুর্ম্মতিগ্রস্ত, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি-বিহীন মনুষ্যদিগের জন্যও তর্পণক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। যাঁহারা শাস্ত্র, গুরু, স্বর্গ, নরক, ধর্ম্মাধর্ম্ম, আচার, অনাচার প্রভৃতির মর্ম্মগ্রহণে

সক্ষম, এবম্বিধ ভক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ আস্তিকের জন্যই এ প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে; যাহাদের মতে পিতামাতার শ্রাদ্ধ বা তর্পণ "বাজে খরচ মাত্র", তাহারা ইহা না পড়িলেও অনুমাত্র অসুখী হইব না। যাহা হউক, অতঃপর তর্পণের উদ্দেশ্যাদি ব্যাখ্যা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

তর্পণ করিতে হইলেই জলে স্নানের আবশ্যক; যাঁহারা পীড়া বা অন্য কারণ বশতঃ জলে স্নান করিতে অশক্ত, তাঁহাদেরও "সাধারণ তর্পণ" হইতে পারে, কিন্তু "বিশেষ তর্পণ" হয় না। শাস্ত্রকারেরা পঞ্চপ্রকার স্নানের ব্যবস্থা দিয়াছেন; তদ্যথা—আগ্নেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম, বায়ব্য এবং দিব্য। পরাশর সংহিতার দ্বাদশাধ্যায়ে নবম শ্লোকে লিখিত আছে,—

"ভস্মদ্বারা শরীর মার্জ্জনা করিলে আগ্নেয় স্নান, জলে অবগাহন করিলে বারুণ, মন্ত্রপাঠ দ্বারা ব্রাহ্ম, ধূলিদ্বারা শরীর মার্জ্জনায় বায়ব্য এবং আকাশের (বৃষ্টির জলে) স্নানকে দিব্যস্নান কহে।"

বিশেষ তর্পণে বারুণ স্নানের প্রয়োজন। বারুণ স্নানের পরে, তর্পণের পাত্রাদি উপস্থিত থাকিতে, যদি কেহ তর্পণ না করে, তাহা হইলে সে মহা অপরাধী হয়।

ভাজনেষু চ তিষ্ঠৎসু স্বস্তি কুর্ব্বন্তি যে দ্বিজাঃ।
ন দেবাস্তৃপ্তিমায়ান্তি নিরাশাঃ পিতরস্তথা॥"

(পরাশর সংহিতা। ১২ অ। ৩৮ শ্লোক)

এই জন্য তর্পণ অতি প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ক্রিয়া। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে;—

"তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎ পিতুস্তৎ পিতুশ্চাপি নামগোত্রাদি পূর্ব্বকং॥"

শাতাতপ সংহিতাকার বলেন, "নিত্য তর্পণ না করিলেও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র অপরাধী হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা নিত্যকর্ম্ম ও নিত্যধর্ম্ম।"

"তর্পণঞ্চ শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকোদ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমং॥"

স্নান করিয়া তর্পণ না করিলে, ব্রাহ্মণের পক্ষে স্নান শুদ্ধ হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"নাস্তিক্য ভাবাদ্যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহ নিঃস্রাবং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ॥"

অর্থাৎ "যদি পুত্র নাস্তিকভাববশতঃ তর্পণ না করে, তাহা হইলে তাহার জলার্থী পিতৃগণ লালা পান করিয়া থাকে।" সুতরাং পিতৃকুলের পরিতৃপ্ত ও উদ্ধার জন্য তর্পণের নিতান্ত আবশ্যকতা বুঝিতে পারা যায়।

নদীতে নাভিজলে তর্পণ করা আবশ্যক। গারুড়ে ২১৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে;—

"এবং স্নাত্বা পিতৄণ দেবান্ মনুষ্যং স্তর্পয়েন্নবঃ।
নাভিমাত্র জলে স্থিত্বা চিন্তয়েদূর্দ্ধমানসঃ॥"

আর্দ্রবস্ত্রেই তর্পণ বিধি। অসুবিধা হইলে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করা অপরাধ বলিবা গণ্য হয় না।

"স্নাতশ্চার্দ্রবাসা দেবপিতৃতর্পণমম্ভঃস্থ এব কুর্য্যাৎ।
পরিবর্ত্তিতবাসাশ্চেৎ তীরমুত্তীর্য্যেতি॥" (বিষ্ণুসংহিতা)
"নিবাশান্তে নিবর্ত্তন্তে বস্ত্রনিষ্পীডনে কৃতে।
তস্মান্ন পীডয়েদ্বস্ত্রমকৃত্বা পিতৃতর্পণং॥"
(পরাশর সংহিতা। ১২ অ। ১৩ শ্লোক)

পরাশর মুনি বলেন, "তর্পণোদ্দেশে ব্রাহ্মণ যখন স্নান করিতে গমন করেন, তখন তাঁহাদের মাতৃ-পিতৃপুরুষ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন।" সুতরাং তর্পণের কতটা প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারিলে কি?

"স্নানার্থং বিপ্রমায়ান্তং দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ।
বায়ুভূতাহি গচ্ছন্তি তৃষ্ণার্ত্তাঃ সলিলার্থিনঃ॥"
(পরাশর সংহিতা। ১২ অ। ১২ শ্লোক)

রবিবার, শুক্রবার, সপ্তমী তিথি, দ্বাদশী তিথি, জন্মদিনে, শ্রাদ্ধদিনে এবং সংক্রান্তিতে তিল তর্পণ করিতে নাই।

"রবিশুক্রদিনেচৈব দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সপ্তম্যাং জন্মদিবসে ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণং॥"
স্মৃতিবচন সংগ্রহঃ।

'সংক্রান্ত্যাং নিশি সপ্তম্যাং রবিশুক্রদিনেতথা।
শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণং॥"
(মৎস্যপুরাণ)

উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ণ কিম্বা বিষুব সংক্রান্তি হইলে, সংক্রান্তিতে অথবা নিষিদ্ধ দিনে তর্পণ হইতে পারে। স্মৃতিধৃতমরীচি বচনে ইহার

প্রমাণ আছে। মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা তাম্র পাত্রই তর্পণের পক্ষে প্রশস্ত। কৃষ্ণতিলের অভাব হইলে কুশধৌত জলে তর্পণ হইতে পারে।

তিলানামপ্যভাবে তু সুবর্ণরজতান্বিতং।
তদভাবেপি সিঞ্চেত্তু দর্ভৈর্মন্ত্রেণ চাপ্যথ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

প্রথমে দেব তর্পণ, তৎপরে মনুষ্য তর্পণ ও দক্ষিণার পূর্ব্বে পিতৃতর্পণ করিতে হয়। ইহা অগ্নিপুরাণের বিধি। স্ত্রীলোক ও শূদ্রেরা তর্পণ করিবার সময় ব্রাহ্মণের সহায়তা লইবেন। পুত্র-পৌত্রাদি-হীনা বিধবা কেবল মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্বামী ও স্বামীর ঊর্দ্ধতন দুইটি পুরুষকে তর্পণ করিতে পারেন।

দেব তর্পণের জল, পূর্ব্বমুখে বসিয়া (বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অন্য করাঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ দিয়া) ঢালিতে হয়। মনুষ্য তর্পণের সময় পশ্চিমমুখে (কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশ দিয়া) জল ঢালিবে। যাঁহাদের উপবীত আছে, তাঁহাদিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া জল ঢালিতে হইবে। ঋষি তর্পণের জল পূর্ব্বমুখে; পিতৃতর্পণ, যমতর্পণ, ভীষ্মতর্পণ ও অন্যান্য তর্পণের জল দক্ষিণ মুখে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের পার্শ্ব দিয়া ঢালা আবশ্যক। এই সময়ে বিপরীতোত্তরীয় হওয়া আবশ্যক।

তর্পণে সকলেরই অধিকার আছে এমত নহে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে নিম্নলিখিতগণ তর্পণ করিতে অধিকারিণী নহেন। (১) অসতী (২) গর্ব্ভবতী (৩) কুষ্ঠা (৪) মদ্যপায়িনী (৫) ঋতুমতী (৬) সন্ন্যাসিনী (৭) অশৌচগ্রস্তা ইত্যাদি। পুরুষদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তি অনধিকারী। (১) পিতা ও মাতা যাহার জীবিত (২) কুষ্ঠরোগী (৩) উন্মাদ (৪) উপনয়ন না হইলে (৫) অশৌচগ্রস্ত (৬) দীক্ষা না হইলে (৭) কুলপুরোহিত ত্যাগ করিলে (৮) নপুংসক (৯) কুলপুরোহিত যাহাদিগের কখনও নাই (১০) ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী। যাহারা সংসারত্যাগী, তাহারা মৃতগুরুর তর্পণ করিবে, পিতার তর্পণ করিবে না। পোষ্যপুত্র নিজ পিতার তর্পণে অনধিকারী।

[ক্রমশঃ।]

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

চূড়ামণি যোগ।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।]

রাগিণী বিভাস,—তাল একতালা।

চল মন চল নলহাটী গ্রাম।
দরশনে—যথা, হরি চক্রাঘাতে, সতী নালা পাতে,
সভৈরব দেবী পীঠ অনুপম॥
পর্ব্বতের প্রান্তে পুরী মনোহর,
তার মাঝে শোভে মন্দির সুন্দর,
(মায়ের) মূরতি নর অগোচর,
(আছে) পাষাণে অঙ্কিত বদন সুঠাম॥ ১
কালিকা নামেতে দেবী অধিষ্ঠান,
যোগেশে হেরিয়ে হবে ধন্য প্রাণ,
(তোমার) হলো দিন প্রায় অবসান,
মাগ মুক্তি দোঁহা পদে দ্বিজাধম রাম॥ ২

কিরীটেশ্বরী।

আমরা ১৪ই চৈত্র প্রাতে গঙ্গাস্নানান্তে পদব্রজে কিরীটেশ্বরী দর্শনে যাত্রা করিলাম। গঙ্গার পশ্চিম পার কিরীট কোনায় কিরীটেশ্বরী দেবীর মন্দির বালিচর হইতে কিঞ্চিদধিক তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এস্থানে ভগবতীর কিরীটপাতে দেবী পীঠের আবির্ভাব। মধ্যাহ্নকালে আমরা অনুযাত্রী সহ কিরীটেশ্বরীর পুরীতে উপনীত হইলাম। তীর্থক্ষেত্রের এরূপ শোচনীয় পরিণাম অতি অল্পই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মলপীঠ রক্ত কৌষেয় বাসাচ্ছাদিত ও পাণ্ডাগৃহে নীত। দেবীর সুবৃহৎ মন্দিরে পাষাণে অঙ্কিত চারুকারুময় কিরীট শোভা পাইতেছে। দর্শকগণ এই স্থানেই পূজা ভোগাদি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হন। কেহ কেহ পাণ্ডার বাটীতে—রক্ত বস্ত্রাচ্ছাদন মধ্যে মা আছেন বলিয়া প্রণামী প্রদান করেন। শুনিলাম, স্থানীয় ভূম্যধিকারী দেবীর পূজা ভোগার্থ

* নলহাটীর দেবীমন্দির হইতে বিদায়কালীন গীত।

মাসিক ১৬৲ টাকা বৃত্তি দিয়া থাকেন, তাহার যে সদ্ব্যবহার হয়, দেব-দেবীর অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় না। পাণ্ডারা যথাকালে আহারাদি করিয়া স্ব স্ব বাটীতে নিদ্রা যান, যাত্রীগণ অধিক বেলায় আসিলে ব্রাহ্মণ হইলে এবং পূজা জানা থাকিলে নিজেকেই পূজা করিতে হয়। দর্শনী প্রণামী ও পূজোপকরণ দ্রব্যাদি গ্রহণ জন্য তাঁহাদের পরিবারস্থ বিধবা ঠাকুরাণীগণ আব্দার করিতে ক্রটি করেন না। দেবীমন্দির মার্জ্জনাদি অভাবে আবর্জ্জনা-পূর্ণ ও দুর্গন্ধময়; ভূকম্পে ভগ্ন ও অসংস্কৃত। অদূরে কালভৈরবের মূর্ত্তি একটী ক্ষুদ্রতম মন্দিরে সংরক্ষিত, অন্যান্য শিবমন্দির সকল ও পুরীর তোষাখানা প্রভৃতি সুরম্য সৌধাবলী ভূপতিত, শতাধিক শিবলিঙ্গ পীঠ-চ্যুত, ভগ্ন, বিকলাঙ্গ ও ধরাশায়িত। যে মন্দিরে সাধকপ্রবর মহারাজ রামকৃষ্ণ যোগাসনে বসিয়া তপ সাধন করিতেন, তাহাও ভূপতিত। হায়! রাজপুরীর ন্যায় সুন্দর সৌধাবলীশোভিত মায়ের সুন্দর পুরী এক্ষণে ধ্বংসাবস্থায় পরিণত। অপূজিত অবস্থায় অনাবৃত প্রাঙ্গনে শিবলিঙ্গ সকল আতপতাপে তাপিত ও ও ধূলী ধূসরিত দেখিয়া নয়নে জল আসিয়াছিল। সর্ব্বহরকালের সর্ব্বগ্রাসিতা শক্তি স্মরণ করিয়া হৃদয়ে কিঞ্চিৎ কালের জন্য বিবেক বৈরাগ্য ও বিষাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনাবৃত প্রাঙ্গনে দেবীমন্দির সম্মুখে সম্বর্ত্ত ভৈরব বলিয়া যে শিবলিঙ্গ পাণ্ডাগণ প্রদর্শন করান, তাহা অনাদি নহে, আধুনিক গঠিত বলিয়া বিবেচিত হয়। পুরাণপ্রসিদ্ধ তাদৃশ পুণ্যক্ষেত্রের ও তদধিষ্ঠিত দেবদেবীর শোচনীয় পরিণাম দর্শনে সন্তপ্তচিত্তে সজলনেত্রে অপরাহ্নে মায়ের নিকট বিদায় লইলাম।

আজ ১৫ই চৈত্র, প্রাতে চূড়ামণি যোগ। সূর্য্যগ্রহণ সন্দর্শনে সহস্রাধিক যাত্রী উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে কলুষনাশিনী গঙ্গানীরে নিমজ্জিত হইলেন। স্নান তর্পণান্তে কেহ ইষ্টমন্ত্র জপ, কেহ দানাদি করিতে লাগিলেন। পুণ্যাত্মা সাধুদিগের কৃত জপ দান ও গঙ্গা স্তোত্র দর্শন ও শ্রবণে আমাদিগের ন্যায় পাষণ্ড হৃদয়েও কিয়ৎকালের জন্য ধর্ম্মভাব ও ভক্তির উদয় হইয়াছিল! গঙ্গাতীরবাসী মাহাত্মা শ্রীযুত মথুরানাথ বসু মহাশয়ের যত্নাতিশয্যে আমরা সপ্তাহকাল গঙ্গাতীরে সুখে অতিবাহিত করিয়া তীর্থকৃত্য সকল সমাধান্তে তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া গতিদায়িনী গঙ্গাদেবীকে দর্শন ও প্রণামান্তর আলয়াভিমুখে পুনর্যাত্রা করিলাম। যাত্রাকালে যোগোপলক্ষে নিম্নলিখিত গানটী মনে মনে গাইলাম।

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

যোগের সেরা যোগ চূড়ামণি ॥
বারুণী, মহা, মহাবারুণী,
দশহারা, ভগীরথ দশহারা,
বুধাষ্টমী, পৌষ নারায়ণী ॥
রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ হইলে,
সোমে শশধরে রাহু গরাশিলে,
তবে এই চূড়ামণিযোগ মিলে,
অনন্ত ফল স্নানে পুরাণে শুনি ॥ ১ ॥
যোগ আছে কত সহস্র সহস্র,
মহাজ্যৈষ্ঠী, ব্যতীপাত, গো সহস্র,
অর্দ্ধোদয় আদি ঘটেনা অজস্র,
সাগর সঙ্গমে স্নানে মুক্ত প্রাণী ॥ ২ ॥
ভবিষ্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণনিচয়,
প্রায়শ্চিত্ত আর তিথিতত্ত্বে কয়,
স্নান যোগ কথা কিন্তু যার হয়,
তত্ত্বে জ্ঞানোদয় ধন্য তায় গণি ॥ ৩ ॥
মুক্ত নহ রাম যদি যাগযোগে।
গঙ্গা করতোয়া, ব্রহ্মপুত্রযোগে,
কর স্নান : হের সাধু কুম্ভযোগে,
মর গঙ্গাতীরে স্মরে সুরধুনী ॥ ৪ ॥
কি আর লিখিব আমি ?
করা'ল ললাট লেখা,
কা'ল বা দুদিন বাদে—
কাল সনে হবে দেখা,
গত বর্ষে গত মম
অর্দ্ধাঙ্গি, রয়েছি একা,
স্মর রাম, কৃষ্ণ নাম
পারের পরম সখা ॥

শ্রীরামজয় বাগচী কবিরত্ন।

উদ্ভিদ ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

বায়ু শোষক রাজা এবং উদ্ভিদগণ চতুর প্রজা। শোষক রাজার গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার বৃক্ষদের কৌশল-জাল অতি অদ্ভুত। মনুষ্যদেহের ফুসফুস যেরূপ রক্ত পরিষ্কার করিয়া ময়লা সকল বাহির করিয়া দেয়, বৃক্ষদের পত্র দ্বারা সেরূপ জলীয় অংশ বাহির হইয়া যায়। কিন্তু বায়ু রাজা শোষক বিধায়, বৃক্ষগুলি হইতে অত্যধিক পরিমাণে জল আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

একটী আতাপাতায় প্রায় দশলক্ষ ছিদ্র আছে। ইহাদের প্রত্যেক ছিদ্র দিয়া নিরন্তর বায়ুরাজ জল গ্রহণ করিতেছেন। বায়ুরাজের জল লইবার বড়ই আগ্রহ। রবিকরে যত অধিক উত্তপ্ত হন, ততই প্রজাদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করেন।

বায়ুরাজকে প্রায় নিরন্তর রবিকর প্রপীড়িত করিতেছে এবং উক্ত পীড়াহেতু বৃক্ষের উপর অত্যাচার যেরূপভাবে বাড়াইয়া দেন, তাহাতে বোধ হয়, বৃক্ষগুলির নিজেদের রক্ষা করিবার কোন কৌশল না থাকিলে দুই চারিদিনেই বেচারিরা ক্ষুধায় শুকাইয়া যাইত। দেখা গিয়াছে, আফ্রিকার ও আমেরিকার মরুভূমে "ক্যাক্‌টী" ও "একেশিয়া" জাতীয় বৃক্ষগুলি চিরকালই বায়ুরাজকে অতি যৎসামান্য কর দিয়াই জীবন ধারণ করিতেছে।

বৃক্ষগুলি মনুষ্যের মত অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে জানে; এবং ভবিষ্যৎ বিপদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রতীকার করিয়া রাখে। মনুষ্যের পক্ষে স্বর্ণ অতি মূল্যবান, কিন্তু উদ্ভিদের পক্ষে জল ততোধিক; যেখানে জল বেশী পাওয়া যাইবে না, তথায় তাহারা জলকে বাতাসের গ্রাস হইতে কৃপণের ধনের অপেক্ষা অধিক যত্নে রক্ষা করে। অবশ্য বৃক্ষদের বায়ুরাজকে জল না দিয়া আদৌ জীবন ধারণ করিবার উপায় নাই। বৃক্ষ সকল সমস্ত খাদ্যই সিকড় দিয়া জলসহ মিশ্রিত অবস্থায় টানিয়া লয়। এই রস তাহাদের শিরা দিয়া উঠিয়া খাদ্যের কাজ করে। রস হইতে খনিজ অংশ টানিয়া লইয়া জলটী পত্ররূপী ফুস্‌ফুস্ মধ্য দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

কিন্তু সজীব থাকিবার এবং পুষ্টি করিবার জন্য আবশ্যকীয় জল আটকাইয়া রাখিবার প্রথা অতি আশ্চর্য্য। কোন একটী বৃক্ষের পাতা লইয়া দেখ, উপর দিকটী নিম্নদিক্ অপেক্ষা অধিক সমতল, যেন বালিশ করা মত। নিম্নদিকটা অপেক্ষাকৃত খস্‌খসে। উপরের দিকটা রৌদ্রের দিকে থাকে বলিয়া, বালিশ করা অংশ দিয়া অধিক জল বাহির হইতে পারে না। জল আটকাইবার জন্য পত্রের একদিক বালিশ করা হয়, এবং ঐ দিকটাই আবার বাহিরের দিকে রাখা হয়। আবার কতকগুলি গাছ পাতার উপর দিয়া জল বাহির করিয়া দিতে আদৌ রাজী নহে, ইহাদের পাতার উপর কোন ছিদ্র নাই।

বিদেশী পাইন্ গাছ প্রায়ই বালুকাময় প্রান্তরদেশে জন্মায়; এই সব স্থানে জলের বড়ই অভাব। অথচ বাজাকে কর দিয়া কোনরূপ নিজেকে প্রাণধারণ করিতে হইবে। তাই ইহাদের পাতা চওড়া না হইয়া সূচের মত সরু সরু হয়, আবার এই সূচপরিমাণ পাতায় ছিদ্রও অতি অল্প সংখ্যক, কাজেই জল খুব সামান্য পরিমাণে বাহির হইয়া যায়।

কপিতে প্রচুর জল চাই। ইহাদের পাতা খুব বড়, অধিক পরিমাণে জল না পাইলে, পাতা দিয়া সমস্ত জলই বাহির হইয়া গিয়া গাছ মরিয়া যাইবে। কিরূপে কপিগাছ সকল বড় এবং ছিদ্রবহুল পাতা থাকিলেও অতি অল্প পরিমাণ জল বায়ুরাজকে দিয়া থাকে, তাহার কৌশল দেখ।

একটী কপিপাতা অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখিলে পাতার উপরিস্থিত সাদা সাদা ধুলার মত গুড়াগুলিকে মোমের সূচিকার মত দেখাইবে। এই সূচিকা সকল পাতার প্রত্যেক ছিদ্রের মুখে বসিয়া আছে—বায়ুরাজের হস্ত হইতে জল রক্ষা করিবার জন্য।

জগতের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া অতি শুষ্কদেশ। তবুও এখানে নানাপ্রকার বৃক্ষলতা জন্মায়। এখানে গাছের পাতাগুলিতে অধিক পরিমাণে ছিদ্র থাকে না এবং গাছে বেশী পাতা হয় না, আর পাতার ধার উপরদিকে থাকে, তেলা ও খস্‌খসে দিক দুইটী দুই পার্শ্বে থাকায়, সূর্য্যকিরণ পাতায় অধিক লাগিতে পারে না। এই দেশে বায়ুরাজের আয় যৎসামান্য।

আকাশিয়া নামক এক প্রকার গাছ এখানে আরও মজা করে। গাছ একটু বড় হইলেই পাতাগুলি ঝরিয়া যায়। কেবল ডাঁটাটীমাত্র থাকে, ইহা হইতে জল বাহির নাম মাত্র হয়। মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্স

যেমন অনেক স্থলে irrecoverable. অর্থাৎ আদায়ের উপায়হীন হয়, এখানেও সেইরূপ।

বৃক্ষগণের এইরূপ নানা কৌশল স্বত্বেও বায়ুরাজের আয় কম নহে। একহাত লম্বা এবং একহাত চওড়া আসমান হইতে প্রত্যহ সাত পাঁইট জল বায়ুরাজ পাইয়া থাকেন। এক একটী কপিগাছ হইতে দৈনিক আড়াই পাঁইট দিতে হয়। আর বড় গাছের ত কথাই নাই। একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছে প্রায় সত্তর লক্ষ পাতা থাকে। এই সব পাতা মাটীতে পাতিয়া দিলে প্রায় ষোল বিঘা জমি ঢাকিয়া যাইবে। গ্রীষ্মকালের রৌদ্রের দিনে এই পাতাগুলি হইতে প্রত্যহ একশত পঁচানব্বই মণ জল বায়ুরাজ শোষণ করিয়া থাকেন।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল।

ভণ্ডের ভগবদ্ভক্তি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ স্তবক।

সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী! রামনগরের যেখানে যাও, সেইখানেই সন্ন্যাসীর কথা, সেইখানেই সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ। হাটে, মাঠে, ঘাটে, পথে কেবল ঐ কথার আন্দোলন, কেবল ঐ কথার আস্ফোটন আভাষণ। ফলতঃ রামনগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার যেন, "সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী" একটা বাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ শুনুন, কত লোক, কত প্রকারে সন্ন্যাসী-গুণ ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত। কেহ বলিতেছে,—"সন্ন্যাসী আজ পাঁচদিন হ'ল, এখানে এসেছেন, কিন্তু আহার করা দূরে থাক্, কেউ তাঁকে এক গণ্ডূষ জল পর্য্যন্ত পান কর্‌তে দেখ্‌লে না!" কেহ বলিতেছে,—"সন্ন্যাসী না কি রাত্রিতে খড়ম পায়ে দিয়ে, গঙ্গার জলের উপর বেড়িয়ে বেড়ান্!" তাহার কথায় পোষকতা করিয়া একজন বলিতেছে,—"হাঁ হাঁ, রামভায়া, তুমি যা বল্লে, সব ঠিক, আমিও এই হীরু খুড়োর কাছে শুনে আস্‌ছি; খুড়োর কথায় অপ্রত্যয় ক'রবার যো নাই,—কেউ কখন তাঁ'কে মিথ্যা বল্‌তে শোনে নাই। ভোর রাতে গরু খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে, তিনি শ্মশানের

দিকে গিয়ে প'ড়েছিলেন। খুড়ো স্বচক্ষে দেখেছেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর খরম পায়ে দিয়ে খটাস্ খটাস্ ক'রে গঙ্গাটা এপার ওপার ক'রছিলেন! জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়াটা কি কম ক্ষমতার কাজ!—সাধু বটে যা হ'ক!"

আর একজন বলিতেছে,—"রাত্রিতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে যা শ্মশান-কালীর দেখা শোনা হয়—এ কথা আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি;—সে দিন মটরের ভুঁই আগ্‌লাতে গিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। আমি যখন ক্ষেতে গিয়েছি, তখন রাত প্রায় দুপুর—দেখলাম, একটা স্ত্রীলোক, আর সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর, দু'জনে মুখোমুখী হ'য়ে ব'সে কি বলাবলি ক'রছে! মেয়েটার চেহারায় আর কালী ঠাক্‌রুণে একটু ভিন্ন ভেদ নাই।—ফাগ্‌জোছ্‌না রাত্রি, আমার ঠিক ঠাওর ছিল।" এইরূপ নানা লোকে নানা কথা বলিতেছে। ফলতঃ, সন্ন্যাসী যে একজন সিদ্ধমহাপুরুষ, এ সম্বন্ধে রামনগরের যাবতীয় নর-নারীর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহেও সন্ন্যাসীর সুনাম রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। সন্ন্যাসী দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে দলে দলে লোক ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যখন যাও, দেখিবে, শ্মশান লোকে লোকারণ্য। একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

রামনগরের কি স্ত্রী, কি পুরুষ কাহারও সন্ন্যাসী দেখিতে বাকি নাই। রাজা প্রতাপনারায়ণও একদিন সদলবলে দেখিতে গিয়াছিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী বাপের একমাত্র আদুরে মেয়ে, তিনিও একদিন সন্ন্যাসী দেখিবার জন্য বাপের নিকট আব্দার করিয়া বসিলেন। তীর্থ-দর্শন, দেবদর্শন এবং সাধু-দর্শন যাত্রায়, আমাদের শাস্ত্রমতে কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও কোন বিশেষ বাধা নাই। বিশেষতঃ, আমাদের শাস্ত্রকারগণ, সাধু-দর্শনের অতি মহৎ ফলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং রাজা বাহাদুর, কন্যার সঙ্গত প্রার্থনায় কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিলেন না। রাজকন্যা, পিতার অনুমতি পাইয়া, মহানন্দে সন্ন্যাসী দর্শনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার নরযান, অনতিবিলম্বে শ্মশানে উপনীত হইল। সমবেত জনমণ্ডলী, "রাজকন্যা আসিয়াছেন, রাজকন্যা আসিয়াছেন" ইত্যাকার ধ্বনি করিতে করিতে শশব্যস্তে ইতস্ততঃ সরিয়া দাঁড়াইল। সাধারণের দৃষ্টি, যাহাতে রাজকন্যার উপর পতিত না হয়, তদুদ্দেশে

সাধুর চতুঃসীমার অন্তর্গত কিয়দংশ স্থান, ইতিপূর্ব্বেই বস্ত্রাবরণে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল, রাজকন্যা ধীরে ধীরে পার্শ্বদ্বার উন্মুক্ত করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর চরণোপান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর এতক্ষণ মুদ্রিতনয়নে চিন্তামগ্ন ছিলেন। হঠাৎ দর্শক-মণ্ডলীর মুখ হইতে রাজকন্যার আগমনসূচকবার্ত্তা তাঁহার শ্রবণে পশিল। মহা বিস্ময়ে নয়ন উন্মীলন করিলেন;—দেখিলেন, তাঁহার বহুকালের আশাবীজ আজ অঙ্কুরিত হইয়া, ফল-কুসুম-ভূষিত অপূর্ব্ব পাদপে পরিণত হইয়াছে! যাঁহার দর্শনাশা হৃদয়ে ধরিয়া, কত দিন, কত পক্ষ, কত মাস, কত বৎসর অনাহার অনিদ্রায় এবং আরও কত কঠোর ক্লেশে যাপন করিয়াছেন এবং এখনও যাঁর আশায় এই পূতিগন্ধি জনশূন্য শ্মশানে কত কষ্টে দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতেছেন, সেই কঠোর সাধনের ধন, সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা দুর্লভদর্শনা রাজনন্দিনী—আজ তাঁহার সমক্ষে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! সন্ন্যাসী, নির্নিমেষনয়নে রাজকুমারীর রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে আবার নয়ন মুদিত করিলেন। সাধুর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। অনুতাপের প্রতপ্ত তুষানল, তাঁহার আপাদমস্তক গ্রাস করিয়া ফেলিল। সাধু যেন আর সে সাধু নহে। সে আশয়, সে অভিলাষ, সে প্রবৃত্তি সমস্তই যেন এখন তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সাধু ভাবিতে লাগিলেন,—আহা! ভগবানের কি অপার মহিমা,—ভণ্ড আমি, মহাপাতকী আমি, নারকী আমি,—আমি তাঁহার অগাধ, অনন্ত, অকূল মহিমাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র বারিকণার মাহাত্ম্য বিদিত নহি; আমি ঘোর অজ্ঞানান্ধ, অসংযতচিত্ত কপটী; আমি তাঁহার ভক্তের ভান করিয়া, ভণ্ড সন্ন্যাসীর কৃত্রিম আবরণে বহুলোক প্রতারিত করিতে সক্ষম হইলাম। হায়! আজ যদি আমি যথার্থই তাঁহার ভক্তের বেশে সজ্জিত হইতে পারিতাম, না জানি, তাহা হইলে আমার কত গৌরবই হইত! ধন্য তিনি! ধন্য তাঁহার ভক্ত! ধন্য তাঁহার ভক্তের পরিচ্ছদে! কিন্তু হে বিভো! এ প্রতারকের এক্ষণে কি গতি হইবে? হে পতিতপাবন! আমার এ মহাপাপের এখন প্রায়শ্চিত্ত কি? হায় হায়! আমি সামান্যা রাজকন্যার ক্ষণভঙ্গুর রূপমোহে এত বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম! ভ্রান্ত আমি—আমি বুঝিতে পারি

নাই, যাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের অস্ফুট জ্যোতিঃ ছায়াকণা, ঐ রমণী কলেবরে প্রতিভাত হইয়াছে, না জানি তাঁহার সেই অপরিসীম অচিন্তনীয় অবিনশ্বর সৌন্দর্য্যসম্ভার, কত মনোহর! সন্ন্যাসী কাঁদিয়া ফেলিলেন। দরদরিতধারে তাঁহার নয়নাপাঙ্গ হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। ভগবদ্ভক্তির সুপবিত্র সুধার আশায়, তাঁহার ভণ্ডতা, কপটতার কলুষকালিমা বিধৌত করিয়া দিল। পূতিগন্ধি-প্রতপ্ত-পয়সা বৈতরণী শীত-সলিলা স্বর্গঙ্গায় পরিণত হইল; দুর্গন্ধি পুরীষ, স্পর্শমণির গুণ ধারণ করিল। সন্ন্যাসী, বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য হইয়া, একাগ্রমনে ভগবানে চিত্ত সমাধান করিলেন। দিবা অবসান হইয়া গেল, রাত্রি আসিল, সন্ন্যাসীর কিন্তু যোগভঙ্গ হইল না।

লক্ষীমণি, প্রতি দিবসের ন্যায় যথাকালে আহার্য্য লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্মশানে আসিলে, সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রতিদিন কত আদর করিয়া আহ্বান করিতেন,—আজ কিন্তু, সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল,—সন্ন্যাসী আজ আর লক্ষীকে আদর করিয়া ডাকিলেন না। যাহা হউক, লক্ষী ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া, স্বয়ংই ডাকিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী নিরুত্তর। ক্রমান্বয়ে কয়েক-দিন রাত্রি জাগরণ করায়, বোধ হয়, তাঁহার অধিক পরিমাণে নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকিবে, এই ভাবিয়া, তাঁহাকে জাগরিত করিবার জন্য পরিশেষে তাঁহার কর্ণমূল সমীপে মুখ লইয়া গিয়া এবং গাত্রে ধীরে ধীরে করাবর্ত্তন করিয়া লক্ষী আবার ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ ডাকার পর সন্ন্যাসীর বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল, নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"কে, লক্ষী! লক্ষী এসেছ? আমার জ্ঞানদায়িনী লক্ষী এসেছ? এস লক্ষী! এস এস!! কিন্তু আমার অঙ্গস্পর্শ ক'রেছ কেন? তোমার পাপাত্মা স্বামীর কলুষময় অঙ্গ স্পর্শ ক'রেছ কেন?"

লক্ষী। বলি, আজ আবার যে, একটা নতুনতর ঢং দেখ্‌ছি?

সন্ন্যাসী। নূতনই বটে।

লক্ষী। আজ না কি রাজকন্যা তোমার এখানে এসেছিলেন?

সন্ন্যাসী। হাঁ।

লক্ষী। তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি কি?

সন্ন্যাসী। হ'য়েছে।

লক্ষ্মী। তবে আবার ভাবনা কেন ?

সন্ন্যাসী। কি জানি, কেন।

লক্ষ্মী। কেন, তুমি ত অনেকবার ব'লেছো—"রাজকন্যাকে একবার মাত্র দেখ্‌তে পেলে, আমার সকল ভাবনা দূর হ'বে—যদি দেখা হ'য়েই থাকে, তবে আবার ভাবনার কারণ কি ?

সন্ন্যাসী। ভাব্‌ছি কেন, সে কথা আর এ পাপমুখে প্রকাশ ক'রবার ইচ্ছা নাই। ধন্য লক্ষ্মী! ধন্য তোমার সতীধর্ম্মে। ধন্য তোমার পাতিব্রত্যে!—তোমার অলৌকিক জ্ঞানপ্রভাবেই, তোমার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলেই আজ আমার এই নূতন ভাবের আবির্ভাব; তোমারই অপরিসীম কৃপাবলে আজ আমি এই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী; তোমারই মহীয়সী মহিমায় আজ আমি পতনোন্মুখ নীরয় হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইলাম।

লক্ষ্মী বহুদিন হইতে স্বামীর মুখে এমন সুমিষ্ট ভাষা শ্রবণ করেন নাই। অদ্যকার এই অচিন্তিতপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত আদরোক্তিতে তাঁহার হৃদয়নিহিত প্রেমসিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠিল। অশ্রুবারি অবারিত হইয়া নির্ঝরিণীর ন্যায় অনর্গল ধারায় নয়নপথে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহাকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া, সন্ন্যাসীও রোদনবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, অশ্রুভারাক্রান্তনয়নে তিনি "ও—লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! আমার প্রাণের লক্ষ্মী! এস এস! এস লক্ষ্মী, তোমার এই নরাধম নিষ্ঠুর স্বামীর কঠিন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও! তোমার সুকোমল অঙ্গ স্পর্শে আমার পাষাণ-কঠিন কলেবর পবিত্র হউক" এই বলিয়া, বিস্তৃত বাহুযুগলে লক্ষ্মীর হৃদয়-দেশ দৃঢ়রূপে বক্ষে ধারণ করিলেন। এইরূপ অবস্থায় অনেকক্ষণ অতি-বাহিত হইল। পরিশেষে লক্ষ্মী বলিলেন, "আর কেন ভাই, অনর্থক এ কষ্টভোগ! চল, এইবার গৃহে গমন করা যাক্‌।"

সন্ন্যাসী। না লক্ষ্মী! আর না—আর আমাকে গৃহগমনে অনুরোধ করো না, গৃহগমনে আর আমার অণুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা নাই। তুমি আমাকে যে পথের পথিক করেছ, বোধ করি তৎসাহায্যে আমি অপেক্ষাকৃত অনেক অনায়াসে গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে পারিব। যদি তোমার অভিলাষ হয়—যদি এইরূপ অবস্থায় আমার সংস্রবে অবস্থান ক্লেশকর বোধ না কর—তবে তোমাকেও আমার সঙ্গী হইতে অনুরোধ করি।